ইউনিট
১৫

বাংলাদেশ ও ইসলাম

ভূমিকা

বাংলাদেশ জনসংখ্যার দিক থেকে বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম মুসলিম দেশ। এদেশের শতকরা প্রায় ৯০ ভাগ লোকই মুসলিম। বাকী ১০ভাগ জনসংখ্যা হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান ও নানা উপজাতি ধর্মের অনুসারী। উদারপন্থী মুসলিম দেশ হিসেবে এদেশের সুখ্যাতি সুপ্রাচীন। এদেশে সকল ধর্মের লোকই মিলে মিশে একত্রে সুখে-শান্তিতে বসবাস করে। অসাম্প্রদায়িক চেতনা, পরমতসহিষ্ণুতা ও জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে পারস্পরিক সহযোগিতার মনোভাব এদেশের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের পরিচয় বহন করে। ব্যক্তি জীবন হতে শুরু করে রাষ্ট্রীয় বৃহৎ কার্যাবলী পালনে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের সমান অধিকার ও মর্যাদা এদেশের ধর্মীয় সম্প্রীতির উজ্জ্বল প্রমাণ। আলোচ্য ইউনিটে বাংলাদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের ধর্ম ইসলাম প্রসঙ্গে ধারণা দেয়া হয়েছে। কেননা সমাজের প্রভাবকে উপাদান হিসেবে ধর্ম সমাজ জীবনকে নানাভাবে নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। এ প্রেক্ষিতে বাংলাদেশে ইসলামের আগমন, বিকাশ, ইসলাম চর্চা ও অনুশীলনের গতিধারা আলোচনা অত্যাবশ্যক। আলোচ্য ইউনিটে ইসলামের প্রাথমিক ধারণার পাশাপাশি বাংলাদেশে ইসলামের বর্তমান অবস্থা উপস্থাপন করে শিক্ষার্থীদেরকে এদেশের মানুষের ধর্মচেতনা সম্পর্কে অবহিত করা হয়েছে।

পাঠ-১ : ইসলামের প্রাথমিক ধারণা

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- ইসলাম ধর্মের পূর্ণাঙ্গ পরিচয় প্রদান করতে পারবেন।
- ইসলাম ধর্মের মূল ভিত্তি সম্পর্কে ব্যাখ্যা দিতে পারবেন।
- ঈমানের অর্থ ও সংজ্ঞা বলতে পারবেন।
- ঈমানের মৌলিক সাতটি বিষয়ের পরিচয় বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করতে পারবেন।
- ইসলাম ধর্মের অনুপম বৈশিষ্ট্যাবলী আলোচনা করতে পারবেন।

ইসলাম পরিচিতি

ইসলাম (اسلام) শব্দটির অর্থ অনুগত হওয়, আনুগত্য করা, আদেশ-নিষেধ মেনে চলা, আত্মসমর্পণ করা, শান্তির পথে চলা ইত্যাদি। ইসলামী পরিভাষায়, জীবনে চলার পথে যাবতীয় প্রয়োজনে আল্লাহ তা'আলার আদেশ-নিষেধ মেনে চলার নামই ইসলাম। অন্যকথায়, কোনরূপ দ্বিধা-সংশয় ব্যতিরেকে সার্বিক জীবনাচরণে আল্লাহ তা'আলার আনুগত্য করা ও তাঁর প্রদত্ত জীবনবিধান অনুযায়ী জীবন যাপন করাকেই ইসলাম বলে। ইসলাম আল্লাহ তা'আলার মনোনীত একমাত্র দীন বা জীবন বিধান। এটি সার্বিক দিক দিয়েই পূর্ণাঙ্গ ও পরিপূর্ণ দীন। মানব জীবনের প্রতিটি বিষয়ই এর আওতাভূক্ত। জন্ম হতে শুরু করে মৃত্যু পর্যন্ত সবধরনের ইহকালীন কাজকর্ম এ জীবন বিধানে সুন্দর ও বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। এমনকি মৃত্যুর পরবর্তী পরকালীন জীবন প্রসঙ্গেও ইসলামে রয়েছে সুস্পষ্ট দিক নির্দেশনা। বস্তুত ইসলামই মহান সৃষ্টিকর্তা প্রদত্ত কল্যাণমুখী ধর্মদর্শন ও জীবনবিধান। আল কুরআনে আল-াহ তা'আলা ঘোষণা করেন- إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الإِسْلاَمُ অর্থ: নিশ্চয় ইসলামই আল্লাহ তা'আলার মনোনীত দীন। (আল-কুরআন, ৩ : ১৯)

ইসলাম ধর্মের মৌলিক বিষয় হলো তাওহীদ বা একত্ববাদ। অর্থাৎ আল্লহ তা'আলা এক ও অদ্বিতীয়। তিনিই এই বিশ্ব জগতের সকল কিছুর স্রষ্টা। আর তিনিই একমাত্র এর রক্ষণাবেক্ষণকারী। প্রকৃতপক্ষে, এ মৌলিক বিশ্বাসের উপরই ইসলাম প্রতিষ্ঠিত। পৃথিবীতে প্রেরিত সকল নবী-রাসূল এ বিশ্বাসের দাওয়াতই প্রদান করেছেন। তাঁদের সকলের ধর্মই ছিল এক ও অভিন্ন। তাঁরা পথহারা মানুষকে এক আল্লাহর আনুগত্য করার দিকে আহ্বান করতেন। আদি পিতা হযরত আদম (আ.) হতে শুরু করে শেষনবী হযরত মুহাম্মদ (স.) পর্যন্ত আগত সকল নবী রাসূলের জীবনেতিহাস হতে আমরা এ শিক্ষাই লাভ করি।

উৎপত্তি

ইসলাম ধর্মের উৎপত্তি হযরত আদম (আ.) এর সময় হতে। আল্লাহ তা'আলা মানব সৃষ্টির পর তাদেরকে হেদায়াতের লক্ষ্যে যে দীনের প্রবর্তন করেন তাই ছিল ইসলাম। আদি পিতা হযরত আদম (আ.) এর মাধ্যমে এ ধর্মের যাত্রা শুরু হয়। এ হিসেবে ইসলামই পৃথিবীর সর্বপ্রাচীন ধর্ম। পরবর্তীতে যুগে যুগে বিভিন্ন নবী রাসূলের দাওয়াত ও কার্যক্রমের মাধ্যমে এ ধর্ম বিকাশ লাভ করে। সর্বশেষ স্তরে হযরত মুহাম্মদ (স.) এর দ্বারা এ দীন পূর্ণাঙ্গতা লাভ করে।

লক্ষ্যণীয় বিষয় এই যে, প্রত্যেক নবী-রাসূলের দীন একমাত্র ইসলাম হলেও তাঁদের শরী'আত ছিল ভিন্ন ভিন্ন। আল কুরআনে ইরশাদ হয়েছে- لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا অর্থ: আমি তোমাদের প্রত্যেকের জন্য শরী'আত ও সুস্পষ্ট পথ নির্ধারণ করে দিয়েছি। (আল-কুরআন, ৫:৪৮)

নবী-রাসূলগণের প্রচারিত ধর্ম আকীদা-বিশ্বাস ও ধর্মের মৌলিক বৈশিষ্ট্যাবলী ছিল অভিন্ন। কিন্তু কালের বিবর্তন, মানব সভ্যতার বিকাশ, মানব সমাজের চাহিদা ইত্যাদির পরিপ্রেক্ষিতে নবীগণের প্রচারিত শরী'আত সর্বকালে, সর্বস্থানে একরূপ ছিল না। বরং প্রয়োজনের তাকিদে একেক জন নবীকে একেক রূপ শরী'আত দেয়া হয়েছিল। আর শরী'আতের এ পার্থক্যের কারণেই অনেকে আল্লাহ তা'আলা প্রেরিত রাসূলগণের ধর্মকে পরস্পর পৃথক মনে করেন। যেমন- মুসা (আ.) এর প্রবর্তিত ধর্মকে ইয়াহূদী ধর্ম, ঈসা (আ.) প্রবর্তিত ধর্মকে খ্রিস্টান ধর্ম বলা হয়ে থাকে। প্রকৃতপক্ষে, তাঁদের প্রচারিত ধর্মও ইসলামই ছিল। তাঁদের ধর্মবিশ্বাস, আল-াহ, পরকাল, ফেরেশতা ইত্যাদির প্রতি ধারণা ও বিশ্বাস ছিল ইসলামের সাথে সম্পূর্ণভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ। কিন্তু তাঁদের আহকাম ও শরী'আতে ছিল ভিন্নতা। পরবর্তীকালে লোকজন তাঁদের অনুশাসন হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে এবং তাঁদের ধর্মগ্রন্থের বিকৃতি, সংযোজন, বিয়োজন ও পরিমার্জন করে নিজ নিজ ধর্মের পৃথক নামকরণ করে। বাস্তবিকপক্ষে, সম্মানিত এ নবীদ্বয়ের প্রচারিত ধর্মও ইসলাম বিরোধী ছিল না।

ক্রমবিকাশ

যুগে যুগে সকল নবী-রাসূলের দ্বারা ইসলাম ধর্ম বিকশিত হয়েছে। নবীগণ পথহারা মানুষকে তাওহীদের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হতে আহ্বান করতেন; পরকালীন জীবনে শান্তির জন্য সততা, মানবিকতা ও উত্তম চরিত্রে চরিত্রবান হওয়ার জন্য অনুপ্রাণিত করতেন। হিংসা-দ্বেষ ও যাবতীয় খারাপ কাজ ত্যাগ করে এক আল্লাহর আনুগত্য ও উপাসনার ভিত্তিতেই তাঁরা তাঁদের অনুসারীদের গড়ে তুলেছিলেন। আর এভাবেই ইসলামের শিক্ষা সর্বযুগে, সর্বস্থানে বিকশিত হয়। হযরত আদম (আ.) হতে শুরু করে বহু নবী-রাসূল ইসলামের বিকাশে অবদান রেখেছেন। এঁদের সংখ্যা অগণিত ও অসংখ্য। হাদীস শরীফে দুনিয়ায় আগত এসব নবী রাসূলের সংখ্যা এক লক্ষ চব্বিশ হাজার মতান্তরে দুই লক্ষ চব্বিশ হাজার বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

এ নবী রাসূলগণের মধ্যে উলে- খযোগ্য কয়েকজনের নাম ও পরিচয় কুরআন ও হাদীসের বর্ণনা দ্বারা জানা যায়। এঁদের মধ্যে হযরত আদম (আ.), হযরত নূহ (আ.), হযরত দাউদ (আ.), হযরত সুলায়মান (আ.), হযরত ঈসা (আ.), হযরত মুসা (আ.), হযরত ইসমাঈল (আ.) হযরত ইয়াকুব (আ.), হযরত ইউসুফ (আ.), হযরত আইয়ুব (আ.), হযরত ইউনুস (আ.) হযরত ইউসুফ (আ.), হযরত ইয়াহইয়া (আ.) প্রমুখ বিশেষভাবে উলে- খযোগ্য।

ইসলামের ইতিহাস পর্যালোচনায় দেখা যায়, হযরত ইবরাহীম (আ.) ই সর্বপ্রথম এ ধর্মের নাম 'ইসলাম' হিসেবে মনোনীত করেন। সাথে সাথে তাঁর অনুসারীদেরকে 'উম্মতে মুসলিমা' হিসেবে নামকরণ করেন। আল-কুরআনে এ প্রসঙ্গে হযরত ইবরাহীমের (আ.) একটি দু'আ এর কথা স্পষ্টভাবে উলে- খ রয়েছে। হযরত ইবরাহীম (আ.) বলেন- رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ অর্থ: হে আমাদের প্রভূ! আমাদের উভয়কে (ইবরাহীম ও ইসমাঈল আ.) মুসলিম তথা আপনার আনুগত্যকারী হিসেবে কবুল করুন এবং আমাদের বংশধরদের থেকেও উম্মতে মুসলিমা বা অনুগত জাতি সৃষ্টি করুন। (আল-কুরআন, ২:১২৮)

আল কুরআনের অন্যত্র বিবৃত হয়েছে- فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ অর্থ: আর তোমরা মুসলিম না হওয়া পর্যন্ত মৃত্যু বরণ করো না (আল-কুরআন, ২ :১৩২)

বস্তুত এ সমস্ত কারণে হযরত ইবরাহীম (আ.) কে মুসলিম জাতির জনক বলা হয়। আল কুরআনে বর্তমান মুসলিম সমাজকে সুস্পষ্টভাবে এ সম্পর্কে অবহিত করে বলা হয়ছে- مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ অর্থ: এটা তোমাদের পিতা ইবরাহীমের ধর্ম। তিনি পূর্বেই তোমাদের নামকরণ করেছেন 'মুসলিম'। (আল-কুরআন, ২২ : ৭৮)

বস্তুত, দুনিয়াতে আগত সকল নবী-রাসূলের প্রচারিত ধর্মেই মৌলিক কোন পার্থক্য ছিল না। বরং সকলেই এক আল-াহর আনুগত্য ও দাসত্বের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত ধর্মের দাওয়াত প্রদান করেন। মানবজাতির হোদায়াতের জন্য আল্লাহ তা'আলা প্রেরিত নবী-রাসূলদের এ আগমনধারা শেষ হয় সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত মুহাম্মদ (স.) এর আগমনের মাধ্যমে। হযরত মুহাম্মদ (স.) হলেন আল্লাহ প্রেরিত সর্বশেষ নবী বা খাতামুন নাবিয়্যীন। তাঁর পরে আর কোন নবী আসবেন না। তাঁর মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা দীন ইসলামের পূর্ণাঙ্গতা দান করেছেন। আল কুরআনে আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেন-

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا

আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দীনকে পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম, আর তোমাদের উপর আমার নি'আমতসমূহকে পরিপূর্ণ করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের দীন মনোনীত করলাম। (আল-কুরআন, ৫:৩)

অতএব, হযরত মুহাম্মদ (স.) এর প্রচারিত ধর্মই ইসলাম, যা পূর্ববর্তী নবী-রাসূলদের প্রচারিত ধর্মের পূর্ণরূপ। তাঁর আনীত শরী'আত কিয়ামত পর্যন্ড় বলবৎ থাকবে। অন্য সকল নবীর শরী'আত এ শরী'আতের আগমনে রহিত হয়ে যায়। সুতরাং বর্তমান কালে ইসলাম হলো- হযরত মুহাম্মদ (স.) এর আনীত শরী'আত যা আল-াহ তা'আলা মানবজাতির হেদায়াতের জন্য নির্ধারণ করে রেখেছেন।

মুফতী আমীমুল ইহসান ইসলাম ধর্মের পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছেন- 'আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে মুহাম্মদ (স.) যে আদর্শ ও বিধি-বিধান নিয়ে এসেছেন, যা অকাট্যভাবে প্রমাণিত তা মনে-প্রাণে বিশ্বাস করাকে ইসলাম বলা হয়।' অন্যকথায় বলা যায়- জীবনের প্রতিটি কাজে কর্মে, চিন্ড়া-চেতনায় রাসূল (স.) এর প্রদর্শিত পথে নিজেকে পরিচালনা করে আল-াহর নিকট পরিপূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করাকেই ইসলাম বলা হয়।

ইসলাম আল্লাহ তা'আলার নিকট গ্রহণীয় একমাত্র ধর্ম। ইসলামী অনুশাসন ও নির্দেশনা অনুযায়ী কৃত সকল কর্মই আল-াহর নিকট গ্রহণযোগ্য হবে। ইসলাম গ্রহণ করার পর নিজ খেয়ালখুশী মত কোন কাজ করা কিংবা রাসূল (স.) এর শরী'আত বাদ দিয়ে অন্য নবীর শরী'আতের অনুসরণ করা কোনরূপেই বৈধ নয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন- وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا অর্থ: আল্লাহ ও তাঁর রাসূল কোন বিষয়ে নির্দেশনা প্রদান করার পরে কোন মুমিন নর বা নারীর উপর সে বিষয়ে ভিন্ন কোন সিদ্ধান্তের অবকাশ থাকে না। আর যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নির্দেশ অমান্য করবে সে স্পষ্টতই বিপথগামী হবে। (আল-কুরআন, ৩৩ : ৩৬)

সুতরাং প্রতিটি ক্ষেত্রে রাসূল (স.) এর নির্দেশনা মুতাবিক জীবন পরিচালনা করাই ইসলামের বিধান। আর যে ব্যক্তি তা নিজ জীবনে বাস্তবায়ন করতে পারেন তিনিই মুসলিম।

ইসলামের বুনিয়াদ বা মুল ভিত্তি

ইসলাম পাঁচটি মূল ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। এই পাঁচটি মূল ভিত্তির কথা মহানবী (স.) -এর হাদীসে বর্ণিত হয়েছে-

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالْحَجِّ وَصَوْمِ رَمَضَانَ

অর্থ: 'ইসলাম পাঁচটি ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত।' যথা- (১) এ কথার সাক্ষ্য দেয়া যে- আল□াহ ব্যতীত আর কোন ইলাহ নেই এবং মুহাম্মদ (স.) আল-াহর বান্দা ও প্রেরিত রাসূল; (২) সালাত কায়েম করা; (৩) যাকাত প্রদান করা; (৪) হজ্জ এবং (৫) রমযানের সিয়াম পালন করা।" (সহীহ্ বুখারী, অধ্যায় : আল-ঈমান)

নিম্নে ইসলামের এ পাঁচটি ভিত্তির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা উপস্থাপন করা হলো-

তাওহীদ ও রিসালাত

ইসলামের সর্বপ্রথম ও প্রধান ভিত্তি হলো তাওহীদ ও রিসালাতে বিশ্বাস করা। তাওহীদ হলো আল্লাহ তা'আলার একত্ববাদ। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা এক ও অদ্বিতীয়। তাঁর কোন শরীক নেই। তিনি সকল কিছুর সৃষ্টিকর্তা, প্রতিপালক ও মালিক -এ কথার স্বীকৃতি প্রদান করা। অন্যদিকে রিসালাত হলো মহানবী (স.) কে রাসূল হিসেবে মেনে নেয়া। অর্থাৎ হযরত মুহাম্মদ (স.) আল্লাহ তা'আলার প্রেরিত রাসূল এ কথার স্বীকৃতি প্রদান করা। তাওহীদ ও রিসালাতের স্বীকৃতি দানের মাধ্যমেই কোন ব্যক্তি ইসলামে প্রবিষ্ট হতে পারে।

সালাত

ইসলামের দ্বিতীয় মূল ভিত্তি হলো সালাত বা নামায। তাওহীদ-রিসালাতে বিশ্বাসী মুসলিমের সর্বপ্রথম ও প্রধান দায়িত্ব হলো সালাত প্রতিষ্ঠা করা। দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করা ফরয বা অত্যাবশ্যক। হাদীসে এসেছে- بَيْنَ الْكُفْرِ وَالْإِيمَانِ تَرْكُ الصَّلَاةِ অর্থ: সালাত ঈমান ও কুফরীর মধ্যে পার্থক্যকারী বিষয়। (সুনান-ই-তিরমিযী, অধ্যায় : আল- ঈমান)

যাকাত

সালাতের পরই যাকাত ইসলামের মূলভিত্তি হিসেবে স্বীকৃত। আল কুরআন ও হাদীসের বহুস্থানে সালাত কায়েম করার নির্দেশের সাথে সাথে যাকাত প্রদান করার জন্যও তাকিদ করা হয়েছে। যাকাত হলো আর্থিক ইবাদাত। কোন মুসলিমের অধীনে নিসাব পরিমাণ ধন-সম্পদ থাকলে তা হতে শতকরা আড়াইভাগ সম্পদ আল্লাহ নির্দেশিত পন্থায় গরীব-দুঃখী ও অন্যদের মধ্যে বণ্টন করাকে যাকাত বলা হয়। যাকাত আদায় করা ব্যক্তিগত বা ঐচ্ছিক দান খয়রাত নয়; বরং এটি ফরয বা অবশ্য পালনীয় কর্তব্য।

হাজ্জ

হাজ্জ হলো ইসলামের অন্যতম প্রধান ভিত্তি। হাজ্জের মাধ্যমে বান্দা আল্লাহ তা'আলার ঘর যিয়ারত করে থাকে। দৈহিক ও আর্থিক সক্ষমতা এবং যাতায়াত পথের নিরাপত্তা থাকলে প্রত্যেক মুমিনের উপর জীবনে একবার হাজ্জ পালন করা ফরয। হাজ্জ পালনের স্থান হলো পবিত্র মক্কা মুয়াযযামায় অবস্থিত বায়তুল্লাহ বা কা'বা শরীফ এবং এর পার্শ্বস্থিত পূণ্যময় স্থানসমূহ।

সাওম

সাওম শব্দটি রোযা নামেও পরিচিত। প্রতি বছর রমযান মাসে পুরো মাসব্যাপী সিয়াম সাধনা করা প্রত্যেক মুসলিমের উপর ফরয। সিয়াম হলো- আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের আশায় সুবহে সাদিক থেকে সূর্য অস্তমিত হওয়া পর্যন্ত পানাহার ও জৈবিক কাজ হতে বিরত থাকা। এর মাধ্যমে বান্দাহ আত্মশুদ্ধি, ধৈর্য, ত্যাগ-তিতিক্ষা ও আল্লাহর নির্দেশ পালনে আনুগত্যের গুণ অর্জন করে থাকে।

ইসলামের বৈশিষ্ট্য

ইসলাম ধর্ম নানা দিক দিয়ে বৈশিষ্ট্যমন্ডিত। আলোচ্য পাঠে ইসলামের কতিপয় বিশেষ বৈশিষ্ট্যের বিবরণ তুলে ধরা হলো-

১. আল্লাহর মনোনীত ধর্ম

ইসলাম আল্লাহ তা'আলার মনোনীত একমাত্র দীন, ধর্ম ও জীবন বিধান। বিশ্বের আর কোন ধর্ম, মতবাদ কিংবা তত্ত্ব মহান স্রষ্টা আল্লাহর মনোনীত ধর্ম নয়। আল-াহ তা'আলা স্বয়ং ঘোষণা করেছেন- إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ অর্থ: নিশ্চয় ইসলামই আল্লাহর নিকট মনোনীত দীন। (আল-কুরআন, ৩ ; ১৯)

অন্য আয়াতে আল্লাহ পাক বলেন- وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ অর্থ: যে ব্যক্তি ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন ধর্ম অনুসরণ করবে, তার নিকট হতে সে ধর্ম কখনোই গ্রহণ করা হবে না। আর আখিরাতে সে নিশ্চিতভাবে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে। (আল-কুরআন, ৩ : ৮৫)

২. পরিপূর্ণ ধর্ম

ধর্মসমূহের মধ্যে ইসলামই একমাত্র পরিপূর্ণ ধর্ম। এতে মানব জীবনের সকল দিকের নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত কোন কিছুই এ ধর্মে বাদ পড়েনি। মানুষের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, প্রশাসনিক ও আন্ড়র্জার্তিকসহ সকল দিকেরই সুস্পষ্ট নীতিমালা ও বিধিবিধান ইসলামে বিদ্যমান। শুধু ইহকালীন জীবনই নয় বরং পরকালীন জীবনের পরিচয়, বর্ণনা ও মুক্তির পূর্বশর্তও ইসলামে বিশদভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেন- الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا। অর্থ: আজ আমি তোমাদের দীনকে পরিপূর্ণ করে দিয়েছি, এবং তোমাদের প্রতি আমার অনুগ্রহকে সম্পূর্ণ করেছি। আর ইসলামকে তোমাদের জন্য মনোনীত করেছি। (আল-কুরআন, ৫ : ৩)

৩. শাশ্বত জীবন ব্যবস্থা

ইসলাম হলো শাশ্বত ধর্ম। এটি সর্বজনীন জীবনবিধান। এর সর্বজনীনতার প্রমাণ হলো- দুনিয়ায় আগত সকল নবী-রাসূলই এ ধর্ম প্রচার করেছেন। হযরত আদম (আ.) হতে শুরু করে হযরত মুহাম্মদ (স.) পর্যন্ত সকল নবী-রাসূলের দীন ছিল ইসলাম। সকলেই মানুষকে ইসলামের দিকে আহ্বান করেছেন। মানব সৃষ্টির সময় হতেই এ ধর্মের সূচনা এবং কিয়ামত পর্যন্ত এ ধর্ম বলবৎ থাকবে। সুতরাং সৃষ্টির শুরু হতে শেষ পর্যন্ত বিদ্যমান ধর্ম হিসেবে ইসলাম নিঃসন্দেহে শাশ্বত জীবন বিধান।

৪. স্বভাবজাত ধর্ম

ইসলাম মানুষের স্বাভাবজাত ধর্ম। এটি মানুষের সহজাত প্রকৃতি ও প্রবণতার একেবারে নিকটবর্তী। এটি যৌক্তিক ও বিজ্ঞানসম্মত ধর্ম। এ ধর্মের সমস্ড় বিধি বিধান, আইন কানুন মানব-প্রজ্ঞা, ও জ্ঞান-বুদ্ধির দ্বারা সমর্থিত। হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে- كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ অর্থ: প্রতিটি শিশুই সহজাত প্রকৃতি তথা ইসলামের উপর জন্ম গ্রহণ করে থাকে।" (সহীহ্ বুখারী, অধ্যায় : আল-জানায়িয)

৫. শান্তি ও সম্প্রীতির ধর্ম

ইসলাম শান্ড়ি ও সম্প্রীতির ধর্ম। ইসলাম ইহকালীন ও পরকালীন সুখ-শান্তি এবং কল্যাণ চায়। মানুষে মানুষে হানাহানি-বিদ্বেষ ইসলামে কাম্য নয়। এজন্য ইসলাম সাম্য-মৈত্রী ও ভ্রাতৃত্বের আদর্শে বিশ্বাসী। লোভ, হিংসা, পরনিন্দা, মিথ্যাচার, প্রতারণা, অন্যায়-অসত্য ইত্যাদি ইসলামে চিরতরে হারাম বা নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। ইসলামের শান্তির প্রমাণ মূলত এর নামের মধ্যেই নিহিত। আরবী ইসলাম শব্দের এক অর্থ শান্তি ও নিরাপত্তা। মূলত বিশ্বজনীন শান্তির ও সম্প্রীতির লক্ষ্যে ইসলামের অবদান অবিস্মরণীয়।

ঈমান

ঈমান শব্দের অর্থ বিশ্বাস। পরিভাষায় ইসলামের মৌলিক বিষয়গুলিকে অন্তরে বিশ্বাস করা, মুখে স্বীকার করা ও তদানুসারে আমল করাকে ঈমান বলা হয়। অন্যকথায় বলা যায়, তাওহীদ তথা আল্লাহর একত্ববাদ, রিসালাত ও আখেরাতে বিশ্বাস করার নামই ঈমান। আল-াহকে এক ও অদ্বিতীয় ইলাহ হিসেবে স্বীকার করা, সর্বকাজে তাঁর প্রভুত্ব ও হুকুম মেনে নেয়া এবং হযরত মুহাম্মদ (স.)-কে আল্লাহর রাসূল হিসেবে এবং তিনি যা কিছু নিয়ে এসেছেন তাঁর প্রতি বিশ্বাস করাকে ঈমান বলে। এককথায় বলা যায়, আল্লাহকে একমাত্র ইলাহ এবং হযরত মুহাম্মদ (স.)কে তাঁর প্রেরিত রাসূল হিসেবে বিশ্বাসের নামই ঈমান। আর যে ব্যক্তি আন্তরিকভাবে এরূপ বিশ্বাস পোষণ করে তাকে বলা হয় মুমিন।

ইসলাম ও ঈমানের সম্পর্ক

ইসলাম ও ঈমানের ঘনিষ্ট ও অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক রয়েছে। এদের একটি অপরটির পরিপূরক। একটি ব্যতীত অন্যটি পূর্ণতা লাভ করতে পারে না। ঈমান ব্যতীত ইসলাম হয় না, আর ইসলাম ছাড়া ঈমানের পরিচয় লাভ করা যায় না। ঈমানের মাধ্যমে মানুষ ইসলামে প্রবেশ করে। ঈমান হলো আন্তরিক বিশ্বাস ও স্বীকৃতির নাম, আর ইসলাম হলো বাহ্যিক কর্ম ও অনুষ্ঠানের নাম।

নিম্নে উপমার মাধ্যমে ঈমান ও ইসলামের সম্পর্কটি ভালভাবে বর্ণনা করা যেতে পারে। যথা- একটি বৃক্ষের মূল বা শিকড় হলো ঈমান। আর কান্ড, শাখা-প্রশাখা সহ সবকিছু ইসলাম। গাছের মূল যত শক্তিশালী হবে এর কা- ও শাখা-প্রশাখাও তত সতেজ হবে। অন্যদিকে শিকড় যদি নষ্ট হয়ে যায় তবে গোটা গাছটিও ধ্বংস হয়ে যায়। তদ্রূপ মানুষের ঈমান যত মজবুত হবে তার বাহ্যিক আমল ও কাজকর্মও তত উত্তম হবে। অপরদিকে ঈমান যদি দুর্বল হয়ে যায় তবে ইসলামের কাজও দুর্বল হয়ে যায়। প্রকৃতপক্ষে, ঈমান ও ইসলাম পরস্পর পরিপূরক। একটি ব্যতীত অন্যটি কল্পনা করা যায় না।

ঈমানের বিষয়বস্তু

ইসলাম ধর্মে বেশ কিছু বিষয়ের প্রতি আন্তরিক বিশ্বাস স্থাপন করা অত্যাবশ্যক। কুরআন ও হাদীসের বিভিন্ন স্থানে এসব বিষয়ের বিবরণ লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। এগুলোর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন না করলে কোন লোক মুমিন বা মুসলিম হতে পারবে

না। আল কুরআনে বর্ণিত হয়েছে- آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ অর্থ: রাসূল তাঁর প্রতি তাঁর প্রতিপালকের পক্ষ হতে যা অবতীর্ণ হয়েছে (আল কুরআন) তাতে ঈমান এনেছেন এবং মুমিনগণও। তাঁরা সকলেই আল-াহ ও তাঁর ফেরেশতাগণ, তাঁর কিতাবসমূহ এবং তাঁর রাসূলগণে ঈমান এনেছেন। (আল-কুরআন, ২ : ২৮৫)

আল কুরআনের অন্য আয়াতে আল-াহ তা'আলা ঘোষণা করেন- وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ অর্থ: কিন্তু পুণ্য আছে কেউ আল-াহ, পরকাল দিবস, ফেরেশতাকুল, আসমানী কিতাবসমূহ ও নবীগণের উপর ঈমান আনয়ন করলে। (আল-কুরআন, ২ : ১৭৭)

এভাবে আল কুরআনের বহু আয়াতে ও হাদীসে ঈমানের বিষয় সম্পর্কে সুস্পষ্ট নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। এগুলো পর্যালোচনায় প্রতীয়মান হয় যে- ঈমানের মূল বিষয় হলো সাতটি। এ সাতটি বিষয়ে বিশ্বাস স্থাপন করা অত্যাবশ্যক। এর যে কোন একটি অবিশ্বাস করলেও কোন ব্যক্তি ঈমানদার হতে পারবে না।

ঈমানের সাতটি বিষয়

ঈমানের প্রধান সাতটি বিষয় সম্পর্কে ঈমানে মুফাসসালে সুস্পষ্টভাবে উলে-খ করা হয়েছে। ঈমানে মুফাস্সাল হলো:

آمَنْتُ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ مِنْ اللَّهِ تَعَالَى وَالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ-

অর্থ: আমি ঈমান আনলাম আল-াহর প্রতি, তাঁর ফেরেশতাগণের প্রতি, তাঁর আসমানী কিতাবসমূহের প্রতি, তাঁর রাসূলগণের প্রতি, আখিরাত বা পরকালের প্রতি, তাকদীর বা ভাগ্যের ভাল-মন্দ একমাত্র আল-াহ পক্ষ থেকে হয়- এ কথার প্রতি, এবং মৃত্যুর পর পুনরুত্থানের প্রতি।

বিবরণ

১. আল□াহর প্রতি বিশ্বাস

ঈমানের সর্বপ্রথম বিষয় হলো আল্লাহ তা'আলার উপর বিশ্বাস। আল্লাহ তা'আলা এক ও অদ্বিতীয়; তাঁর কোন শরীক নেই। এ গোটা বিশ্বজগতে যা কিছু আছে তিনিই সবকিছুর স্রষ্টা। তিনি সবকিছুর পালনকর্তা, রক্ষাকর্তা, রিযিকদাতা; তিনি চিরঞ্জীব, চিরস্থায়ী সত্তা। তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা ও সর্বশক্তিমান। তিনি বিধানদাতা, প্রভু, সবকিছুর মালিক, সৃষ্টি-ধ্বংস, জন্ম-মৃত্যু সবকিছুই তাঁর অধীন। তিনি যাবতীয় গুণাবলীর আধার। এক কথায় তিনিই একমাত্র প্রতিপালক এবং সবকিছু তাঁরই নিয়ন্ত্রণে। আল্লাহ তা'আলাকে এরূপ সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী হিসেবে বিশ্বাস করা ঈমানের সর্বপ্রধান বিষয়।

২. ফেরেশতাগণের প্রতি বিশ্বাস

ফেরেশতাগণের প্রতি ঈমান হলো- এ কথার বিশ্বাস স্থাপন করা যে, ফেরেশতাগণ আল্লাহর এক বিশেষ সৃষ্টি; তাঁরা নূরের তৈরী। তাঁরা সদাসর্বদা আল্লাহর হুকুম পালনে নিয়োজিত। তাঁদের কোনরূপ পানাহার বা জৈবিক চাহিদা নেই। আল্লাহ পাক বিশ্বজগৎ পরিচালনার নানা কাজে তাদেরকে নিয়োগ করে রেখেছেন এবং তাঁরা সঠিকভাবে সে সব দায়িত্ব পালন করে চলেছেন।

৩. কিতাবসমূহের প্রতি বিশ্বাস

আল্লাহ তা'আলা পথভ্রষ্ট মানুষের হেদায়াতের জন্য স্বীয় বাণী সম্বলিত বহু কিতাব প্রেরণ করেছেন। এগুলো আসমানী কিতাব নামে পরিচিত। এগুলোর সংখ্যা ১০৪ খানা। তন্মধ্যে ৪ খানা বড়। এগুলো হলো তাওরাত, যাবুর, ইনজীল ও কুরআন। আর বাকী ১০০ খানা ছোট। এগুলোকে বলে সহীফা। আল কুরআন সর্বশেষ আসমানী কিতাব। এটি সর্বজনীন ও কিয়ামত পর্যন্ত বলবৎ থাকবে। এর কোনরূপ বিকৃতি আজ পর্যন্ত হয়নি এবং ভবিষ্যতেও হবে না। এ সমস্ত আসমানী কিতাব আল্লাহর পক্ষ হতে অবতারিত এবং এগুলোতে বর্ণিত আদেশ-নিষেধ ও বিধি-বিধান সবই মানুষের জন্য কল্যাণকর। কিতাবসমূহের প্রতি এরূপ বিশ্বাস স্থাপন ঈমানের অপরিহার্য বিষয়।

৪. নবী-রাসূলগণের প্রতি বিশ্বাস

নবী-রাসূলগণ ছিলেন আল্লাহ তা'আলার মনোনীত বান্দা। তাঁরা যুগে যুগে পথভোলা মানুষকে আল-াহর পরিচয় প্রদান করেছেন; আসমানী কিতাবের মাধ্যমে মানুষকে সত্য পথের নির্দেশনা প্রদান করেছেন; সত্য-অসত্য, ন্যায়-অন্যায়ের পার্থক্য শিখিয়েছেন; ইহকালীন কল্যাণ ও পরকালীন মুক্তির সন্ধান দিয়েছেন। তাঁরা ছিলেন নিষ্পাপ। আল্লাহ তা'আলা এ পৃথিবীতে সর্বমোট এক লক্ষ চব্বিশ হাজার মতান্ড়রে দুই লক্ষ চব্বিশ হাজার নবী রাসূল পাঠিয়েছেন। তন্মধ্যে কতিপয় ছিলেন রাসূল, বাকিরা হলেন নবী। এঁদের সকলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে।

আমাদের প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মদ (স.) ছিলেন সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী ও রাসূল। তিনি খাতামুন নাবিয়্যীন। তাঁর পর আর কোন নবী আসবেন না। তাঁর মাধ্যেমেই সকল নবী-রাসূলের আগমন ধারা ও কার্যাবলী পূর্ণতা লাভ করেছে। তাঁর আনীত বিধি-বিধান ও শরী'আতই কিয়ামত পর্যন্ত মানুষের মুক্তির পথনির্দেশ স্বরূপ।

৫. আখিরাতের প্রতি বিশ্বাস

আখিরাত শব্দের অর্থ পরকাল। ইসলামের মতে, এ দুনিয়ার জীবনই মানুষের শেষ নয়। বরং মৃত্যুর পরও আরেকটি জীবন রয়েছে। সে জীবনের নাম আখিরাত। আখিরাত হলো অনন্ত কালের জীবন। সেখানে দুনিয়ার জীবনের ভাল-মন্দ, পাপ পূণ্যের প্রতিদান দেয়া হবে। হাদীস শরীফে এসেছে- 'দুনিয়া হলো আখিরাতের শস্যক্ষেত্র'। সুতরাং দুনিয়ায় যে যেরূপ কাজ করে আখিরাতে সে তদ্রুপ প্রতিফল পাবে। কেউ যদি ভাল কাজ করে তবে সে পাবে চিরশান্তির জান্নাত। আর যে মন্দ কাজ করে, তার স্থান হবে শাস্তিময় জাহান্নাম।

প্রকৃতপক্ষে আখিরাতের জীবনই প্রকৃত জীবন। এ জীবনের জন্য দুনিয়াতেই ঈমান ও ইসলামের প্রকৃত অনুসারী হতে হবে। কবর, হাশর, মীযান, পুলসিরাত, জান্নাত, জাহান্নাম ইত্যাদি আখিরাতের এক একটি স্তর।

৬. তাকদীরের প্রতি বিশ্বাস

তাকদীর অর্থ ভাগ্য বা নিয়তি। তাকদীরে বিশ্বাসের অর্থ হলো- মানুষের ভাল-মন্দ যা কিছুই হয় সবকিছুই তাকদীরে লিখিত রয়েছে। আল্লাহ হলেন তাকদীরের নিয়ন্ত্রক। বান্দার ভাল-মন্দ সবকিছুই আল্লাহ পাক নির্ধারণ করে দেন। সুতরাং মানুষ তার সাধ্যমত চেষ্টা-সাধনা করবে, কাজ করবে। অত:পর কাজের ফলাফলের জন্য আল্লাহর উপর ভরসা করবে। কাজ সফল হলে আল্লাহর শুকরিয়া বা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে। আর বিফল হলে সবর বা ধৈর্যধারণ করবে। এটাই তাকদীরের শিক্ষা।

৭. পুনরুত্থানের প্রতি বিশ্বাস

মানুষের মৃত্যুই শেষ নয়। বরং মৃত্যুর পর আল-াহ তা'আলা আবার মানুষকে জীবিত করবেন। এ বিশ্বাস রাখা প্রত্যেক মুমিনের জন্য অপরিহার্য। মৃত্যুর পর এ পুনরুত্থানের দ্বারাই মানুষের পরকালীন জীবনের শুরু হবে। সেখানে আল-াহ তা'আলা মানুষের সকল কাজের হিসাব চাইবেন। অত:পর মানুষকে স্বীয় কর্ম অনুযায়ী প্রতিফল প্রদান করবেন। দুনিয়াতে ভাল কাজের পুরস্কার স্বরূপ সেখানে রয়েছে জান্নাত; আর মন্দ কাজের তিরস্কার স্বরূপ রয়েছে জাহান্নাম।

উপর্যুক্ত বিষয়াবলী ঈমানের মূল বিষয়। এগুলোর প্রতিটির উপর ঈমান আনা অপরিহার্য; এর কোন একটিতেও বিশ্বাস না করলে কেউ ঈমানদার বা মুমিন হতে পারবে না।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন: ১৫.১

নৈর্ব্যক্তিক উত্তর প্রশ্ন

এক কথায় উত্তর দিন

১. ইসলাম অর্থ কি?
২. খাতামুন নাবিয়্যীন কে?
৩. ইসলামের বুনিয়াদ কয়টি?
৪. ঈমানের মূল বিষয় কয়টি?
৫. ফেরেশতা কারা?
৬. তাকদীর কি?
৭. আসমানী কিতাব কয়খানা?

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১. ইসলামের উৎপত্তি কখন হয়- বর্ণনা করুন।
২. ইসলামের অনুপম বৈশিষ্টাবলী আলোচনা করুন।
৩. ইসলামের পরিচয় বর্ণনা করুন।
৪. 'ইসলাম আল□াহর একমাত্র মনোনীত জীবন বিধান'- ব্যাখ্যা করুন।
৫. ইসলামের বুনিয়াদ কয়টি ও কি কি?
৬. তাওহীদের মর্মার্থ ব্যাখ্যা করুন।
৭. ইসলাম ও ঈমানের সম্পর্ক বিশ্লেষণ করুন।
৮. ঈমানে মুফাসসাল লিপিবদ্ধ করুন।

রচনামূলক প্রশ্ন ঃ

১. ইসলাম কি? এর উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ আলোচনা করুন।
২. ইসলামের বুনিয়াদগুলোর সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদান করুন।
৩. ঈমানের পরিচয় দিন। ঈমানের প্রধান সাতটি বিষয় সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করুন।

পাঠ-২ : মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় ইসলামের ভূমিকা

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি

- ইসলাম ধর্মে মানব জাতিকে প্রদত্ত মর্যাদা ব্যাখা করতে পারবেন।
- নারীর মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় ইসলামের অবদান বিশ্লেষণ করতে পারবেন।
- জীবনের নিরাপত্তা প্রদানে ইসলামের বিধিমালা প্রসঙ্গে আলোচনা করতে পারবেন।
- মাল, সম্পদ সংরক্ষণে ইসলামের অবদান বর্ণনা করতে পারবেন।
- সম্ভ্রম রক্ষায় ইসলামের বিধান আলোচনা করতে পারবেন।

মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় ইসলাম

ইসলাম আল্লাহ তা'আলার মনোনীত একমাত্র পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান। মানব জীবনের সকল সমস্যার বাস্তবসম্মত সমাধান এতে বিদ্যমান। মানবাধিকার সংক্রান্ত বিষয়ে ইসলামের বিধিবিধান সর্বকালে সব মানুষের জন্য প্রযোজ্য। মানুষের মর্যাদা, জীবন-সম্পদ-সম্ভ্রমের নিরাপত্তা বিধানে ইসলামের ভূমিকা অবিস্মরণীয়। আলোচ্য পাঠে সংক্ষিপ্তভাবে এ প্রসঙ্গে আলোচনা করা হলো-

মানব মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় ইসলাম

ইসলাম মানব জাতিকে সম্মানিত করেছে। ইসলাম ধর্ম মতে, মানুষ হলো সকল সৃষ্টির সেরা সৃষ্টি বা আশরাফুল মাখলুকাত। আল্লাহ তা'আলা মানব জাতিকে সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টির মর্যাদা প্রদান করেছেন। যেমন- وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ অর্থ: আমি আদম সন্তানকে মর্যাদা দান করেছি। (আল-কুর'আন, ১৭ : ৭০)

১. ফেরেশতাদের উপর মর্যাদা দান

ইসলাম মানবজাতিকে আল্লাহর বিশেষ সৃষ্টি ফেরেশতাদের উপর মর্যাদা দান করেছে। ফেরেশতাদের চেয়ে মানুষের সম্মান ও মর্যাদা বেশি। কেননা ফেরেশতাগণ কোনরূপ প্রতিবন্ধকতা ছাড়াই আল্লাহর আনুগত্য করেন। পক্ষান্তরে মানুষ নানারূপ পার্থিব বাঁধা, শয়তানের প্ররোচনা ইত্যাদি মুকাবিলা করে আল্লাহ তা'আলার অনুগত হয়ে থাকে। আল্লাহর নিকট একজন প্রকৃত মুমিন ফেরেশতার চাইতেও অধিক প্রিয়। আল্লাহপাক ফেরেশতাগণকে হযরত আদম (আ.) কে সিজদা করতে হুকুম প্রদান করে এর প্রমাণ উপস্থাপন করেছেন।

২. খলীফা হিসেবে মর্যাদা দান

মানুষ এ পৃথিবীতে আল্লাহ তা'আলার খলীফা। আল্লাহর খলীফা হওয়ার মর্যাদা আর কোন সৃষ্টি লাভ করতে পারেনি। আল্লাহর ঘোষণা- إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً অর্থ: আমি পৃথিবীতে আমার খলীফা বা স্থলাভিষিক্ত প্রেরণ করতে চাই। (আল-কুরআন, ২ : ৩০)

৩. আকৃতিগত দিক হতে

গঠনাকৃতির দিক দিয়েও মানব জাতি সমস্ত সৃষ্টির সেরা। আল্লাহ তা'আলা অত্যন্ত সুন্দর করে মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। হাত-পা, মাথা, চোখ-কান-নাক প্রভৃতি যথাযথ জায়গায় প্রতিস্থাপন করে তাকে সুন্দর অবয়ব দান করেছেন। আল কুরআনে আল্লাহ স্বয়ং ঘোষণা করেছেন- لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ অথ: নিশ্চয়ই আমি মানুষকে অতি উত্তম আকৃতিতে সৃষ্টি করেছি। (আল-কুরআন, ৯৫ : ০৪)

৪. জ্ঞান-বুদ্ধি-বিবেক দান

আল্লাহ তা'আলা সুন্দর আকৃতির সাথে সাথে মানুষকে জ্ঞান-বুদ্ধি-বিবেক দান করেছেন; কথা বলার যোগ্যতা দান করেছেন। এসব কিছুর মাধ্যমে মানুষ ন্যায়-অন্যায়, সত্য-মিথ্যা, ভাল-মন্দ ইত্যাদি বুঝতে পারে, নিজের সৃজনশীলতাকে কাজে লাগাতে পারে। সৃষ্টিজগতের অন্যান্য জীব-জন্তু ও সৃষ্টিকে এগুলো দেয়া হয়নি। এভাবে আল্লাহ তা'আলা মানুষকে অন্যদের উপর প্রাধান্য দিয়েছেন।

৫. নবী-রাসূল ও আসমানী গ্রন্থ প্রদান

আল্লাহ তা'আলা একমাত্র মানুষের মধ্যেই নবী-রাসূল প্রেরণ করেছেন। মানুষের হেদায়াতের জন্য তাঁদের প্রতি আসমানী কিতাব অবতীর্ণ করেছেন। অন্য কোন সৃষ্টি এ বিশেষ মর্যাদায় অভিষিক্ত নয়। নবী-রাসূলগণ আল্লাহর মনোনীত প্রিয় বান্দা। আল্লাহ তা'আলা মানুষের মধ্য হতে নবী-রাসূল নির্বাচিত করে প্রকারান্তরে মানুষকেই সম্মনিত করেছেন। আল কুরআনে

এসেছে- اللَّهُ يَصْطَفِي مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ النَّاسِ। অর্থ: আল্লাহ ফেরেশতা ও মানুষের মধ্য হতে রাসূল মনোনীত করেন। (আল-কুরআন, ২২ : ৭৫)

৬. বন্ধু হিসেবে গ্রহণ

মানুষের মধ্যে কতিপয়কে স্বীয় বন্ধু হিসেবে ঘোষণা দিয়েও আল্লাহ তা'আলা মানব মর্যাদা প্রকাশ করেছেন। নবীগণের মধ্যে হযরত মুহাম্মদ (স.) হযরত ইব্রাহীম (আ.) প্রমুখ আল্লাহর বিশেষ বন্ধু হিসেবে পরিচিত। আল্লাহ তা'আলা বলেন- وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا। অর্থ: আর আল্লাহ ইব্রাহীমকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করেছেন। (আল-কুরআন, ৪:১২৫)

৭. সকল সৃষ্টির পরিচালক হিসেবে মর্যাদা দান

আল্লাহ তা'আলা গোটা বিশ্বজগতের সমস্ত কিছুই মানুষের উপকারের জন্য সৃষ্টি করেছেন। আসমান-যমীন, বায়ু-পানি, পাহাড়-পর্বত, নদী-নালা, পশু-পাখি, চন্দ্র-সুর্য সবকিছুই আল্লাহ মানুষের অধীন করে দিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেন- هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا অর্থ: তিনি পৃথিবীতে যা কিছু আছে তা তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন। (আল-কুরআন, ২ : ২৯)

অন্য আয়াতে বর্ণিত হয়েছে- أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ অর্থ: তোমরা কি দেখ না যে, আল্লাহ তা'আলা আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সবই তোমাদের কল্যাণে নিয়োজিত রেখেছেন। (আল-কুরআন, ৩১ : ২০)

বস্তুত নানাভাবে আল্লাহ তা'আলা মানুষকে সম্মানিত করেছেন। অতএব, মানুষের উচিত এ সম্মানের শুকরিয়া আদায় করা ও আল্লাহর আনুগত্য করা।

নারীর অধিকার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় ইসলাম

নর-নারীর সমন্বয়ে মানব জাতি গঠিত। ইসলাম এক্ষেত্রে নরকে যেমন মর্যাদা-অধিকার প্রদান করেছে, তেমনি নারীকেও দিয়েছে যথোপযুক্ত মর্যাদা। ইসলামে মানুষ হিসবে নর-নারী উভয়েই সমান মর্যাদার অধিকারী। নিম্নে নারীর অধিকার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় ইসলামের অবদান আলোচনা করা হল-

১. মাতা হিসেবে মর্যাদা

ইসলামে নারীকে মা হিসেবে সর্বোচ্চ সম্মান ও মর্যাদা দেয়া হয়েছে। পৃথিবীর অন্যকোন ধর্ম কিংবা বিধানে এরূপ সম্মান দেয়া হয়নি। নবী (স.) ঘোষণা করেছেন- اَلْجَنَّةُ تَحْتَ اَقْدَامِ الْاُمَّهَاتِ অর্থ: মায়ের পদতলে সন্ড়ানের জান্নাত (মুসনাদ-ই-শিহাব আল কাযায়ী)। অর্থাৎ মায়ের আনুগত্য ও খেদমতের মাধ্যমেই সন্তান বেহেশত লাভ করতে পারে। অন্য এক হাদীসে নবী (স.) পরপর তিনবার মায়ের অধিকারের কথা উল্লেখ করেছেন। অত:পর চতুর্থবার পিতার অধিকারের কথা বলেছেন। সুতরাং বোঝা যায়, পিতা অপেক্ষা মাতা সদাচরণ পাবার ক্ষেত্রে তিনগুণ বেশি হকদার।

২. স্ত্রী হিসেবে মর্যাদা

স্ত্রী হিসেবে নারীর মর্যাদা স্বামীর সমান। আল কুরআনে বলা হয়েছে- هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ অর্থ: তারা (স্ত্রীগণ) তোমাদের ভূষণ; আর তোমরা তাদের ভূষণ। (আল-কুরআন, ২ : ১৮৭)

অন্য আয়াতে স্ত্রীদের প্রতি সদাচরণের নির্দেশ দিয়ে বলা হয়েছে- وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ অর্থ: তাদের সাথে সৎভাবে জীবন যাপন কর। (আল-কুরআন, ৪ : ১৯) বিদায় হজ্জের ভাষণে নবী (স.) স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেন, فَاتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللَّهِ অর্থ: তোমরা তোমাদের স্ত্রীদের অধিকার আদায়ের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় কর। কেননা তোমরা তাদেরকে আল্লাহর আমানত হিসেবে গ্রহণ করেছ। (সহীহ মুসলিম, অধ্যায় : আল-হাজ্জ)

৩. কন্যা হিসেবে মর্যাদা

ইসলাম কন্যা হিসেবে নারীদের যথাযথ মর্যাদা প্রদান করেছে। জাহিলী যুগে কন্যা সন্তান জন্ম হলে সাথে সাথে তাকে জীবন্ড় কবরস্থ করা হত। ইসলাম মানবতা বিরোধী এ ঘৃণ্য প্রথাকে চিরতরে হারাম ঘোষণা করেছে। আল্লাহ বলেন- وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ অর্থ: তোমরা দারিদ্রের ভয়ে তোমাদের সন্তানদেরকে হত্যা করো না। (আল-কুরআন, ১৭ : ৩১)

হাদীস শরীফে কন্যা সন্তানের জন্ম প্রসঙ্গে মুমিনদের উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে। বর্ণিত হয়েছে- যে ব্যক্তির প্রথম সন্তান কন্যা সন্তান সে সৌভাগ্যবান। এছাড়াও কিয়ামতের দিন কন্যা সন্তানের পিতা, যে তার কন্যাকে উপযুক্ত ভাবে লালন পালন করেছিল এবং রাসূল (স.) পাশাপাশি অবস্থান করবেন মর্মেও বর্ণনা রয়েছে।

৪. ধর্মীয় ক্ষেত্রে

ইসলামে পুরুষের ন্যায় নারীর ধর্মীয় বিধি বিধান পালনেও প্রতিদান লাভের ক্ষেত্রে সমান মর্যাদার অধিকারী। এ ক্ষেত্রে নর-নারী কোনরূপ পার্থক্য ইসলামে করা হয়নি। আল্লাহ তা'আলা বলেন-

وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا

মুমিন নর-নারী যেই নেক আমল করবে সেই জান্নাতে প্রবেশ করবে; আর এ ব্যাপারে কারো প্রতি বিন্দু পরিমাণও অন্যায় করা হবে না। (আল-কুরআন, ৪ : ১২৪)

৫. অন্যান্য অধিকার

জীবনে অন্যান্য সকল ক্ষেত্রেই ইসলাম পুরুষের ন্যায় নারীকেও যথোপযুক্ত মর্যাদা ও অধিকার দিয়েছে। নারীর আর্থ-সামাজিক অধিকার সংরক্ষণ করেছে। ইসলাম মতে, নারী তাঁর যোগ্যতা অনুযায়ী প্রয়োজনে যে কোন অর্থনৈতিক কাজ করতে পারবে। উত্তরাধিকার সম্পদে নারীর নির্ধারিত অংশ আল কুরআনেই বিবৃত হয়েছে। ইসলাম রাজনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে নারীর যথাযথ অধিকার প্রদান করেছে। এছাড়া স্বামী নির্বাচন, বিবাহ বিচ্ছেদ ইত্যাদি বৈবাহিক আচার আচরণেও নারীর প্রাপ্য মর্যাদা ইসলামে স্বীকৃত।

জীবনের নিরাপত্তা বিধানে ইসলাম

মানবজীবন খুবই মূল্যবান। এটি আল্লাহ প্রদত্ত একটি বড় নি'আমত। এজন্য ইসলাম মানব জীবনকে সবধরণের ঝুঁকি, ক্ষতি ও বিপদ হতে রক্ষা করার জন্য বিশেষ বিধান প্রদান করেছে। ইসলামের এসব বিধানের অনুসরণের মাধ্যমে মানব জীবন সুখ-শান্তি ও নিরাপত্তায় পরিপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে। জীবনের নিরাপত্তা রক্ষায় ইসলামের গৃহীত পদক্ষেপগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো-

ক. মৌলিক অধিকারের নিশ্চয়তা

অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা, শিক্ষা ইত্যাদি মানুষের মৌলিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃত। ইসলাম মানুষের এসব অবশ্য প্রয়োজনীয় অধিকারগুলোর নিশ্চয়তা বিধান করতে বদ্ধপরিকর। ইসলামী সমাজব্যবস্থায় ও শরী'আতে প্রত্যেক মানুষই এসব অধিকার পূরণের জন্য স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারবে। কেউ যদি অক্ষম হয় তবে এসব মৌলিক অধিকার পূরণের জন্য ইসলামী সরকার বা দায়িত্বশীল ব্যক্তিগণ দায়ী থাকবেন।

খ. হত্যা নিষিদ্ধ

ইসলাম সমস্ড় মানুষকে জীবনের নিরাপত্তা প্রদান করেছে। এ লক্ষ্যে কেউ কাউকে হত্যা করা হারাম ঘোষণা করা হয়েছে। আল কুরআনে বলা হয়েছে- وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ অর্থ: আর আল্লাহ পাক যাকে হত্যা করা হারাম করেছেন এরূপ ব্যক্তিকে অন্যায় ভাবে হত্যা করো না। (আল-কুরআন, ১৭ : ৩৩) অন্য আয়াতে এসেছে- مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا অর্থ: যে কোন লোককে হত্যা বা যমিনে বিপর্যয় সৃষ্টি ব্যতীত হত্যা করেছে, সে যেন সমস্ড় মানুষকে হত্যা করেছে। (আল-কুরআন, ৫ : ৩২)

গ. শাস্তি বিধান

মানুষের জীবনের নিরাপত্তা বিধানে ইসলাম হত্যার জন্য বিশেষ শাস্তির বিধান চালু করেছে। যেন শাস্তির ভয়েও একজন অন্যজনকে হত্যা করা হতে বিরত থাকে। ইসলামী আইনে এ শাস্তির নাম কিসাস। অন্যায়ভাবে কেউ কাউকে হত্যা করলে কিসাস বা দিয়াত তথা রক্তপণ দেওয়ার বিধান রয়েছে। আল্লাহ পাক বলেন- وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ অর্থ: হে জ্ঞানবানগণ! তোমাদের জন্য কিসাস (হত্যার বিনিময়ে হত্যা) বিধানে নিশ্চয়ই জীবন (জীবনের নিরাপত্তা) রয়েছে। (আল-কুরআন, ২ : ১৭৯)

ঘ. শান্তিপূর্ণ জীবন পরিচালনা

সমাজে সকলে একত্রে মিলেমিশে বসবাস করতে হয়। এক্ষেত্রে ইসলাম সকলকে সহানুভূতি ও সহযোগিতার মানোভাব নিয়ে বসবাসের নির্দেশ দেয়। পরস্পরকে কষ্ট দেয়া, অত্যাচার উৎপীড়ন করা ইত্যাদি ইসলামে কঠোরভাবে নিষেধ করা হয়েছে। মহানবী (স.) বলেন- "যার অত্যাচার থেকে তার প্রতিবেশী নিরাপদ নয়, সে বেহেশতে যেতে পারবে না"। অন্য হাদীসে এসেছে- الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ অর্থ: প্রকৃত মুসলিম সে ব্যক্তি যার হাত ও মুখ হতে অন্য মুসলিম নিরাপদ থাকে (সহীহ বুখারী)। অর্থাৎ সে তার কথা ও কাজ দ্বারা অন্য কাউকে কষ্ট দেয় না।

ঙ. অপরাধমূলক কার্যকলাপ নিষিদ্ধ

মানব সামজের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য ইসলাম সর্বপ্রকার অপরাধমূলক কাজ নিষিদ্ধ করেছে। যেমন মদ্যপান, চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই, সন্ত্রাসবাদ, মিথ্যাচার, প্রতারণা, খুন-খারাবি, মারামারি ইত্যাদি। বস্তুত এ সমস্ত কাজ নানাভাবে জীবনের নিরাপত্তাকে বিঘ্নিত করে। এগুলো অবৈধ ঘোষণার মাধ্যমে ইসলাম মানব জীবনকে পাপ পঙ্কিলতামুক্ত, পবিত্র ও নিরাপদ করে তুলতে প্রয়াসী হয়।

সম্পদের নিরাপত্তা বিধানে ইসলাম

ধন-সম্পদ মানব জীবনের জন্য আবশ্যকীয় উপাদান। ইসলাম এ সম্পদ রক্ষারও প্রয়োজনীয় বিধান প্রণয়ন করেছে। যেমন-

ক. রিযিকদাতা আল্লাহ

ইসলাম মতে, আল্লাহ তা'আলা সকল সৃষ্টির, সকল মানুষের রিযিকদাতা। তিনিই সকলের রিযিকের ব্যবস্থা করেন। আল-কুরআনে এসেছে- وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الأَرْضِ إِلا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا অর্থ: যমীনের বুকে এমন কোন প্রাণী নেই যার রিযিক আল-াহর দায়িত্বে নেই। (আল-কুরআন, ১১: ০৬)

সুতরাং রিযিকের জন্য অন্যের ধন-সম্পদে লোভী না হয়ে আল-াহর উপর ভরসা করাই ইসলামের মৌলিক বিধান।

খ. সম্পদের সুষম বণ্টন

অর্থনৈতিক বৈষম্য মানবজীবনে নানা সমস্যার জন্ম দেয়। সেজন্য ইসলামে যেমন প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদ উপার্জনের অনুমতি রয়েছে। সাথে সাথে গরীব ও দুঃস্থ লোকদের উন্নয়নের দায়িত্বও প্রদান করেছে। একজন সম্পদের পাহাড় গড়বে আর অন্যজন না খেয়ে মারা যাবে এমন অর্থনীতি ইসলাম সমর্থন করে না।

গ. যাকাত ও দান-সাদকাহ

ইসলামী সমাজে অর্থনৈতিক নিরাপত্তার অন্যতম রক্ষাকবজ হলো যাকাত। এটি ইসলামের অন্যতম বুনিয়াদ। মূলত এর উপরই ইসলামী অর্থনীতির অবকাঠামো প্রতিষ্ঠিত। যাকাত প্রসঙ্গে হাদীসে এসেছে- "(যাকাত) তোমাদের ধনীদের নিকট হতে নিয়ে গরীবদের মধ্যে বণ্টন করে দেয়া হবে" (বুখারী)। যাকাত হলো গরীবের হক। এর যথাযথ আদায়ের মাধ্যমে সমাজে পারস্পরিক সুসম্পর্ক সৃষ্টি হয়। যা ধন-সম্পদের নিরাপত্তায় বিশাল ভূমিকা পালন করে। এছাড়াও নফল দান-সাদকাহ সমাজে অর্থনৈতিক গতিশীলতা আনার মাধ্যমে সকলের সম্পদের নিশ্চয়তা বিধান করে থাকে।

ঘ. উত্তরাধিকার আইন

উত্তরাধিকার ধন-সম্পদ বণ্টন নানা সময় মানুষের মধ্যে নিরাপত্তাহীনতা সৃষ্টি করে। এ লক্ষ্যে ইসলাম উত্তরাধিকার সম্পদের নির্ধারিত আইন প্রদান করেছে। আল কুরআনে আল-াহ পাক সমস্ড় উত্তরাধিকারী এবং তাদের প্রাপ্য সম্পদের বিস্তারিত ও সুস্পষ্ট বিধান প্রদান করেছেন। ফলে সম্পত্তি বণ্টন সংক্রান্ড় বিবাদ-বিসম্বাদ হতে সহজেই মুক্তি পাওয়া সম্ভব।

ঙ. আর্থিক অনাচার নিষিদ্ধ

ধন-সম্পদের নিরাপত্তা বিঘ্নিত করে এমন সবধরনের কাজই ইসলামে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। জুয়া, লটারী, চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই, রাহাজানি, লুটতরাজ, জবরদখল, প্রতারণা, ফটকাবাজী, হারাম পণ্যের ব্যবসা ইত্যাদি সবকিছু ইসলাম অবৈধ বলে ঘোষণা করেছে। সম্পদের নিরাপত্তা বিধানে এর ভূমিকা অসামান্য।

সম্ভ্রমের নিরাপত্তা বিধানে ইসলাম

মান-সম্মান ও ইজ্জত সম্ভ্রম রক্ষায় ইসলামের যুগান্ড়কারী পদক্ষেপ গুলো হলো-

ক. সম্ভ্রমহানি নিষিদ্ধ

অপরের ইজ্জত ও মর্যাদা রক্ষা করা প্রত্যেক মুসলিমের দীনী কর্তব্য। কোনভাবেই অপরের মর্যাদা ক্ষুণ্ন করা যাবে না। বিদায় হজ্জের ভাষণে মহানবী (স.) ঘোষণা করেছেন- 'মনে রেখো! আজকের এ দিন, এ শহর ও এ মাস যেমন তোমাদের নিকট সম্মানিত; তেমনি তোমাদের পরস্পরের রক্ত, সম্পদ এবং ইজ্জতও আল্লাহ তা'আলা পবিত্র ঘোষণা করেছেন।' অর্থাৎ অপরের সম্ভ্রমের হানি করা পবিত্র ও সম্মানিত বিষয়কে নষ্ট করার সমতুল্য অপরাধ হিসেবে বিবেচ্য।

খ. পর্দার বিধান

নর-নারীর ইজ্জত সম্মান রক্ষার জন্য ইসলাম পর্দার বিধান প্রবর্তন করেছে। ইসলাম ঘোষণা করেছে- قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ অর্থ: (হে নবী!) আপনি মুমিনদেরকে বলুন তারা যেন তাদের দৃষ্টি আনত রাখে এবং স্বীয়

লজ্জাস্থানের হেফাজত করে। (আল-কুরআন, ২৪ : ৩০) অন্য আয়াতে মুমিন নারীদেরকে উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে- يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ অর্থ: তারা যেন তাদের চাদরের কিয়দাংশ নিজেদের উপর টেনে দেয়। (আল-কুরআন,৩৩ : ৫৯)

গ. গীবত-অপবাদ নিষিদ্ধ

মানুষের মানসম্মানের হানিকর গীবত-অপবাদ ও ছিদ্রান্বেষণ করা ইসলামে সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ। এগুলো কবীরা গুনাহ। আল্লাহ বলেন- وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ অর্থ: আর তোমরা একে অপরের গোপনীয় বিষয় সন্ধান করো না এবং গীবত করো না (একে অপরের পশ্চাতে নিন্দা করো না।) তোমাদের কেউ কি তার মৃত ভাইয়ের গোশত খেতে পছন্দ করবে। বস্তুত তোমরা তো একে অপছন্দই করে থাক। (আল-কুরআন, ৪৯ : ১২)

ঘ. ঠাট্টা-উপহাস ইত্যাদি নিষিদ্ধ

ইজ্জত-সম্মানের নিরাপত্তা বিধানে ইসলাম পরস্পর ঠাট্টা, উপহাস, তিরস্কার করা, দোষারোপ করা, মন্দ নামে ডাকা ইত্যাদি বিষয়ও নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। আল-াহ বলেন- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ অর্থ: হে ঈমানদারগণ! তোমাদের এক সম্প্রদায় যেন অন্য সম্প্রদায়কে পরস্পর উপহাস না করে। (আল-কুরআন, ৪৯ : ১১) এ আয়াতের অন্য অংশে এসেছে- وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ অর্থ: আর তোমরা একে অপরের প্রতি দোষারোপ করো না ও একে অপরকে মন্দনামে ডেকো না। কেননা ঈমানের পর মন্দ নামে ডাকা অত্যন্ত গর্হিত কাজ। (আল-কুরআন, ৪৯ :১১)

ঙ. অন্যান্য বিধিমালা

সম্মান ও মর্যাদা রক্ষায় ইসলাম ব্যক্তি পর্যায় হতে শুরু করে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে আরো বহু বিধান প্রবর্তন করেছে। যেমন- অশ-ীলতা, বেহায়াপনা, পর্দাহীনতা, নাচ-গান, মেলা ইত্যাদি নিষিদ্ধ করেছে। এছাড়াও ইসলাম বিনা অনুমতিতে অন্যের ঘরে প্রবেশ করা, কাউকে মন্দ নামে ডাকা, উপহাস করা, গিবত করা ইত্যাদিও নিষিদ্ধ করেছে।

ইসলাম মানব জীবনের সার্বিক উন্নতি ও সাফল্য লাভের প্রয়াসী। এ প্রেক্ষিতে পার্থিব জীবনে ইসলাম যেমন নর-নারী সকলের মর্যাদা ও সম্মানের স্বীকৃতি প্রদান করেছে তেমনি সকলের অধিকার রক্ষারও যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। জীবন-সম্পদ ও সম্ভ্রম রক্ষায় শুধু উপদেশ ও উৎসাহই নয় বরং প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে শাস্ড়ির বিধান প্রবর্তন করে এগুলোর নিরাপত্তা নিশ্চিত করেছে। ইসলামের এ আদর্শ অনুসরণ করলে সকলেই সমান অধিকার ভোগ করতে সক্ষম হবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন: ১৫.২

নৈর্ব্যক্তিক উত্তর-প্রশ্ন

এক কথায় উত্তর দিন

১. পৃথিবীতে মানুষ কার খলীফা?
২. আকৃতিগত দিক হতে সবচেয়ে উত্তম সৃষ্টি কোনটি?
৩. সদাচরণ পাওয়ার ক্ষেত্রে পিতা অপেক্ষা মাতার মর্যাদা কতগুণ বেশি?
৪. হত্যার শাস্ড়ি সংক্রান্ড় ইসলামী আইনের নাম কি?
৫. ইসলামী অর্থনীতি কোন বিষয়ের উপর প্রতিষ্ঠিত?
৬. গীবতের হুকুম কি?

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. "মানুষ ফেরেশতাদের চাইতেও শ্রেষ্ঠ"- ব্যাখ্যা করুন।
২. সকল সৃষ্টিই মানব কল্যাণের জন্য সৃষ্ট -এ সম্পর্কিত আল কুরআনের দু'টি আয়াত লিপিবদ্ধ করুন।
৩. স্ত্রী হিসেবে নারীর মর্যাদা আলোচনা করুন।
৪. পর্দা সংক্রান্ত বিধান বর্ণনা করুন।

রচনামূলক প্রশ্ন

১. ইসলামের আলোকে মানব-মর্যাদা সম্পর্কে বর্ণনা করুন।
২. নারীর মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় ইসলামের ভূমিকা বিশ্লেষণ করুন।
৩. ইসলাম কীভাবে জীবনের নিরাপত্তা বিধান করেছে- ব্যাখ্যা করুন।
৪. সম্পদ ও সম্ভ্রমের নিরাপত্তা বিধানে ইসলামের ভূমিকা ব্যাখ্যা করুন।

পাঠ-৩ : মানব জীবনে ইসলাম

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি

- পারিবারিক জীবনে ইসলামের বিধান সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন।
- সামাজিক জীবনে ইসলামের ভূমিকা বিশ্লেষণ করতে পারবেন।
- অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ইসলামের বিধান আলোচনা করতে পারবেন।
- ইসলামী রাজনৈতিক চিন্ড়াধারা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

মানব জীবনে ইসলাম

মানবজাতির ইহকালীন কল্যাণ ও পরকালীন মুক্তির একমাত্র দিক নির্দেশক ইসলাম। এতে মানব জাতির পার্থিব কল্যাণ ও সফলতার পূর্ণাঙ্গ বিবরণ রয়েছে। ব্যক্তিজীবন হতে শুরু করে রাষ্ট্রীয় জীবনের সকল দিকের আলোচনা ইসলামে রয়েছে। অলোচ্য পাঠে মানব জীবনের গুরুত্বপূর্ণ কতিপয় দিক ও বিভাগ প্রসঙ্গে ইসলামের আদর্শ ও বিধিমালা উপস্থাপন করা হলো-

পারিবারিক জীবনে ইসলাম

পরিবর মানুষের প্রাচীনতম সংগঠন। সমাজবিজ্ঞানী ম্যাকাইভার বলেন- "স্বামী স্ত্রীর মিলনের মাধ্যমে সন্তান উৎপাদন ও প্রতিপালনের অতি সংক্ষিপ্ত অথচ স্থায়ী প্রতিষ্ঠান-ই হলো পরিবার"। অন্যকথায় স্বামী-স্ত্রী, তাদের সন্তান-সন্ততি, বাবা-মা, ভাইবোন প্রভৃতি লোকদের নিয়ে গড়ে উঠে একটি পরিবার।

আর যে পরিবার ইসলামের আদর্শ ও বিধি বিধানের আলোকে পরিচালিত হয় তাকে ইসলামী পরিবার বলা হয়। এ সংজ্ঞার আলোকে বোঝা যায় যে, ইসলামী পরিবারের সদস্যগণকে অবশ্যই মুসলিম হতে হবে। অমুসলিম কেউ ইসলামী পরিবারের সদস্য হতে পারবে না। যেমন- হযরত নূহ (আ.) মহাপ-াবনের সময় তাঁর ছেলে কেন'আন যখন ডুবে যাচ্ছিল তখন বলেছিলেন- رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي অর্থ: হে প্রতিপালক! নিশ্চয়ই আমার পুত্র আমার পারিবারের একজন। (আল-কুরআন, ১১ : ৪৫) জবাবে আল-াহ বলেন- يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ অর্থ: হে নূহ! নিশ্চয়ই সে আপনার পরিবারভূক্ত নয়। কেননা সে সৎকর্মশীল নয়। (আল-কুরআন, ১১ : ৪৬)

ইসলাম মতে, পারিবারের উৎপত্তি ঘটে আদি পিতা হযরত আদম (আ.) ও হাওয়া (আ.) এর মাধ্যমে। তাঁদের সৃষ্টি করে আল্লাহ তা'আলা তাঁদেরকে একত্রে বসবাসের নির্দেশ দেন। আল্লাহ বলেন- يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا অর্থ: হে আদম! তুমি এবং তোমার স্ত্রী বেহেশতে একত্রে বসবাস শুরু কর। আর জান্নাতের যেখান হতে ইচ্ছা অবাধে পানাহার কর। (আল-কুরআন, ২ : ৩৫) মূলত এর মাধ্যমে মানব সমাজে পরিবার প্রথার উন্মেষ ঘটে এবং পরবর্তীতে সারা বিশ্বে ক্রমবিকশিত হয়।

ইসলামে পারিবারিক জীবনের গুরুত্ব অত্যধিক। এ জন্য ইসলাম পরিবারের প্রতিটি সদস্যের দায়িত্ব-কর্তব্য ও অধিকার পৃথক-ভাবে বর্ণনা করে দিয়েছে। নিম্নে পারিবারের সদস্যদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে- সংক্ষিপ্ত আলোচনা উপস্থাপন করা হলো-

মাতা-পিতার দায়িত্ব ও কর্তব্য

সন্তানের প্রতি পিতামাতার দায়িত্ব ও কর্তব্য অনেক। কেননা পিতামাতাই পরিবারের অভিভাবক। তাঁদের যত্নে ও আদর-ভালবাসায় সন্তান বড় হয়ে ওঠে। মাতা দীর্ঘ প্রায় দশ মাস সন্তানকে গর্ভে ধারণ করেন। অত:পর সন্তান জন্ম লাভ করলে মাতা-পিতাকে বহু গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করতে হয়।

সন্তান জন্মের সাথে সাথে তার ডান কানে আযান এবং বাম কানে ইকমাত দিতে হয়। অত:পর ৭ম দিবসে ভাল নাম রেখে আকীকা করতে হয়। ছেলে সন্তানের খৎনা করতে হয়। রাসূল (স.) বলেছেন- "কারো সন্তান জন্মগ্রহণ করলে তার জন্য একটি উত্তম নাম রাখবে ও আদব কায়দা শিক্ষা দেবে।" (মুসান্নাফ-ই-আব্দুর রায্যাক)

অত:পর সন্ড়ানকে অত্যন্ত স্নেহে প্রতিপালন করতে হবে। এক্ষেত্রে ছেলে সন্তান ও মেয়ে সন্তানে কোনরূপ পার্থক্য করা চলবে না। একটু বড় হলে সন্তানকে উপযুক্ত শিক্ষা প্রদান করতে হবে। সর্বদা সন্তানের কল্যাণ কামনা করা এবং বদ দু'আ না করাও মাতা-পিতার অন্যতম কর্তব্য।

মাতা-পিতার প্রধানতম কর্তব্য হলো সন্তানকে আদব কায়দা শিক্ষা দেয়া ও ধর্মের পথে পরিচালনা করা। আল্লাহ তা'আলা কুরআনে হযরত লুকমানের একটি বাণী উলে-খ করেছেন- يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ অর্থ: হে বৎস! তুমি আল-াহর সাথে কাউকে শরীক করো না। নিশ্চয়ই শিরক মারাত্মক অপরাধ। (আল-কুরআন, ৩১ : ১৩)

রাসূলুল্লাহ (স.) বলেন, مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرٍ অর্থ: তোমরা সন্তানকে সাত বছর বয়সে নামাযের আদেশ দাও এবং দশ বছর বয়সের সময় প্রয়োজনে মারধর করো।" (সুনান-ই-অবূ দাউদ, অধ্যায় : আস-সালাত)

প্রকৃত পক্ষে, এভাবে মাতা-পিতার তত্ত্বাবধানে সন্তান প্রাপ্তবয়স্ক হয়ে ওঠে। মাতা-পিতার প্রদত্ত শিক্ষা সন্তানের ভবিষ্যৎ জীবনের পাথেয়।

সন্তানের দায়িত্ব ও কর্তব্য

আল্লাহ তা'আলা মাতাপিতার প্রতি সন্তানের দায়িত্ব ও কর্তব্য বর্ণনা করে ঘোষণা করেছন-

وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا – وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا

অর্থ: তোমার প্রতিপালক আদেশ দিয়েছেন তিনি ব্যতীত অন্য কারও ইবাদাত না করতে ও পিতা-মাতার প্রতি সদ্ব্যবহার করতে। তাঁদের একজন অথবা উভয়েই তোমার জীবদ্দশায় বার্ধক্যে উপনীত হলে তাঁদেরকে 'উফ্' বলো না এবং তাঁদেরকে ধমক দিও না। বরং তাঁদের সাথে সম্মানসূচক কথা বলো। মমতা বশে তাঁদের প্রতি নম্রতার পক্ষপুট অবনমিত কর এবং বলো- হে আমার প্রতিপালক! তাঁদের প্রতি দয়া কর যেভাবে শৈশবে তাঁরা আমাকে প্রতিপালন করেছিলেন। (আল-কুরআন, ১৭ : ২৩-২৪)

আলোচ্য আয়াতে মাতা-পিতার প্রতি সন্তানের কর্তব্য সুস্পষ্ট ভাবে বর্ণিত হয়েছে। সুতরাং সন্তানদের উচিত- মাতা-পিতার প্রতি সদ্ব্যাবহার করা, তাদের সেবা-যত্ন করা, কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা, তাঁদের আহবানে সাড়া দেয়া, সর্বকাজে তাঁদের আনুগত্য করা, তাঁদের কথার অবাধ্য না হওয়া, তাঁদের জন্য দু'আ ও ক্ষমা প্রার্থনা করা, তাঁদের ওয়াদা, ওসীয়ত ও ঋণ আদায় করা। সর্বোপরি তাঁরা অসন্তুষ্ট হন এরূপ কোন কাজ না করাই সকল সন্তানের প্রধানতম দায়িত্ব ও কর্তব্য।

স্বামীর কর্তব্য

স্বামী-স্ত্রীর মিলনেই সংসারের জন্ম। সুতরাং সংসারের সুখের জন্য উভয়ের সুন্দর সম্পর্ক প্রয়োজন। এ লক্ষ্যে ইসলাম প্রত্যেকেরই দায়িত্ব ও কর্তব্য বণ্টন করে দিয়েছে। স্বামীর কর্তব্য হলো- সর্বাবস্থায় স্ত্রীর সাথে উত্তম ব্যবহার করা। আল□াহ তা'আলার নির্দেশ- وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ অর্থ: তোমরা স্ত্রীদের সাথে উত্তমভাবে জীবন যাপন কর (আল-কুরআন, ৪:১৯)। স্বামীর অন্যতম কর্তব্য হলো স্ত্রীর ভরণ-পোষণ আদায় করা। রাসূলুল্লাহ (স.) বলেন- أَطْعِمُوهُنَّ مِمَّا تَأْكُلُونَ وَاكْسُوهُنَّ مِمَّا تَكْتَسُونَ তুমি যা খাবে, স্ত্রীকেও তা খাওয়াবে; যা পরবে স্ত্রীকেও তা পরতে দেবে। (সুনান-ই-আবূ দাউদ, অধ্যায়: আন-নিকাহ্)

এছাড়া, স্ত্রীর মহর আদায় করা, স্ত্রীর মর্যাদা ক্ষুণ্ন না করা, নির্দোষ হাসি-তামাশা করা, স্ত্রীর সম্পদ গ্রাস না করা, স্ত্রী অশিক্ষিত হলে শিক্ষার ব্যবস্থা করা, দীনের পথে পরিচালিত করা; সর্বোপরি- স্ত্রীর সার্বিক অধিকার আদায়ে সচেষ্ট থাকা স্বামীর অন্যতম কর্তব্য।

স্ত্রীর কর্তব্য

পরিবারের শান্ড়ির জন্য স্ত্রীদের বেশ কিছু কর্তব্য পালন করতে হয়। যেমন স্ত্রীদের প্রথম কর্তব্য হলো- স্বামীর আনুগত্য করা; কেননা ইসলাম স্বামীকে পারিবারিক কর্তা হিসেবে নিয়োগ করেছে। আল-াহ তা'আলা বলেন- وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ অর্থ: পুর"ষদেরকে নারীদের উপর মর্যাদা দেয়া হয়েছে। (আল-কুরআন, ২ : ২২৮)

এছাড়া স্বামীর কল্যাণ কামনা করা, কৃতজ্ঞতা ও সহানুভূতি জানানো, ভাল ব্যবহার করা, পরিবারের সম্পদ সংরক্ষণ করা, নিজ সতীত্বের হেফাজত করা, স্বামীর অবর্তমানে পরিবারের দায়িত্ব পালন করা, পরিবারের যাবতীয় বিষয়ের তত্ত্বাবধান করা ইত্যাদিও স্ত্রীদের কর্তব্য হিসেবে চিহ্নিত। স্ত্রীদেরকে এ বিষয়ে কিয়ামতে জিজ্ঞাসাও করা হবে। হাদীসে এসেছে- وَالْمَرْأَةُ

رَاعِيَةٌ عَلَى أَهْلِ بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ– অর্থ: নারী তার স্বামীর পরিবার পরিজনের রক্ষক, তত্ত্বাবধায়ক। আর এসব বিষয়ে তাঁকে কিয়ামতে জিজ্ঞাসাও করা হবে। (সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম)

ভাই-বোনের দায়িত্ব ও কর্তব্য

পরিবারের মধ্যে ভাই-বোনের পারস্পরিক অধিকার ও কর্তব্য ও বেশ গুরুত্বপূর্ণ। ইসলাম এ ব্যাপারেও যথাযথ নির্দেশনা প্রদান করেছে। ভাই-বোনের কর্তব্য হলো- একে অপরকে সহযোগিতা করা, শিক্ষা দীক্ষায় সাহায্য করা, পরস্পর স্নেহ ভালবাসা, শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা, অন্যের হক আদায় করা, ঝগড়াঝাটি ও মারামারি না করা, পরস্পর সদ্ব্যবহার করা, একে অন্যের গীবত না করা, কল্যাণ কামনা করা, পরস্পর সদ্ভাব ও সুসম্পর্ক বজায় রাখা ইত্যাদি।

সামাজিক জীবনে ইসলাম

মানুষ সামাজিক জীব। সমাজ জীবনে মানুষকে নানামুখী দায়িত্ব পালন করতে হয়। ইসলাম মানুষের সামাজিক জীবনের এসব দায়িত্ব ও কাজকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করে আলোচনা করেছে। নিম্নে কতিপয় দিক উপস্থাপিত হলো-

আত্মীয় স্বজনের প্রতি কর্তব্য

পরিবারের সদস্যদের বাইরে মানুষের অনেক আত্মীয়-পরিজন, বন্ধু-বান্ধব ও হিতাকাঙ্ক্ষী বিদ্যমান। সমাজে তাদের সাথে মিলে মিশে বসবাস করতে হয়। আল্লাহ তা'আলা তাদের সাথে ভাল ব্যবহারের নির্দেশ দিয়ে বলেন- قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ অর্থ: (হে রাসূল!) আপনি বলুন, কল্যাণকর যে জিনিস তোমরা ব্যয় কর তা পিতা-মাতা, আত্মীয় স্বজনের জন্য ব্যয় করবে। (আল-কুরআন, ২ : ২১৫)

সমাজ জীবনে আত্মীয় পরিজনের প্রতি কর্তব্য হলো- তাদের সাথে সদাচরণ করা, সুসম্পর্ক বজায় রাখা, হক আদায় করা, বিপদে আপদে সাহায্য-সহযোগিতা করা, তাঁদের সেবা যত্ন করা, বিরক্ত না করা ইত্যাদি। বস্তুত আত্মীয়তার সম্পর্ক ইসলামে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এজন্যই মহনবী (স.) বলেছেন-لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعُ رَحِمٍ অর্থ: আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী ব্যক্তি বেহেশতে প্রবেশ করতে পারবে না। (সহীহ্ মুসলিম, অধ্যায় : আল-বির্ ওয়া আস-সিলাহ ওয়া আল-আদাব)

পাড়া-প্রতিবেশীর প্রতি দায়িত্ব

সাধারণ অর্থে প্রতিবেশী হলো যারা আশেপাশে বসবাস করেন। ইসলামে প্রতিবেশীর পরিচয় সুনির্দিস্ট করে বলা রয়েছে। হাদীসে এসেছে, 'আশেপাশের চল্লিশ বাড়ি পর্যন্ত সকলেই প্রতিবেশী'। এ হিসেবে ইমাম যুহরী বলেন- নিজ বাড়ির সামনে-পিছনে, ডানে বামে প্রতিদিকেই চল্লিশ বাড়ির সকল লোকই প্রতিবেশী হিসেবে গণ্য হবে। ইসলামে পাড়া-প্রতিবেশীর অধিকার ও কর্তব্য অত্যন্ত ব্যাপক। আল্লাহ বলেন- وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ অর্থ: আর সদাচরণ কর নিকটাত্মীয় প্রতিবেশী, পার্শ্ব প্রতিবেশী ও পার্শ্ববর্তী সহচরের সাথে। (আল-কুরআন, ৪ : ৩৬)

হাদীস শরীফে বহু স্থানে প্রতিবেশীর অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কে বর্ণনা রয়েছে। যেমন, মহানবী (স.) বলেন- مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يُؤْذِي جَارَهُ 'আল-াহ ও পরকালের প্রতি যে ঈমান রাখে, সে যেন তাঁর প্রতিবেশীকে কষ্ট না দেয়।' (সহীহ্ বুখারী, অধ্যায় : আন-নিকাহ্)।

সুতরাং, প্রতিবেশীর সাথে উত্তম আচরণ করা অত্যন্ত জরুরী। এছাড়া প্রতিবেশীর হক সংরক্ষণ করা, নিরাপত্তা দান করা, কষ্ট না দেয়া, উপহার-উপঢৌকন প্রদান করা, বিপদে সাহায্য সহযোগিতা করা, সুসম্পর্ক বজায় রাখা ইত্যাদি একজন মুমিন ব্যক্তির অন্যতম দায়িত্ব ও কর্তব্য হিসেবে পরিগণিত।

অন্য মুসলিমের প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য

সমাজে বসবাসরত অন্যান্য মুসলিম নাগরিকের প্রতিও প্রতিটি মুসলিম ব্যক্তিরই কিছু দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেন- إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ অর্থ: নিশ্চয়ই মুমিনগণ পরস্পর ভাই ভাই। (আল-কুরআন, ৪৯ : ৯)

হাদীস শরীফে এসেছে-

الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يُسْلِمُهُ وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرُبَاتِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

অর্থ: 'মুসলিমগণ পরস্পর ভাই ভাই। সুতরাং সে তার উপর অত্যাচার করবে না, তাকে অত্যাচারীর হাতে সোপর্দ করবে না। যে তার ভাইয়ের অভাব পূরণ করবে আল-াহ তার অভাব পূরণ করে দেবেন। যে ব্যক্তি কোন মুসলিমের বিপদ দূর

করবে আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন তার বিপদসমূহের মধ্য হতে একটি বিপদ দূর করে দেবেন। আর যে ব্যক্তি কোন মুসলিমের দোষত্রুটি গোপন রাখবে। আল্লাহ তা'আলাও কিয়ামতের দিন তার দোষত্রুটি গোপন রাখবেন।' (সহীহ্ বুখারী, অধ্যায় : আল-মাযালিম ওয়া আল-গাসাব) অন্য হাদীসে এসেছে- الْمُسْلِمُونَ كَرَجُلٍ وَاحِدٍ إِنْ اشْتَكَى عَيْنُهُ اشْتَكَى كُلُّهُ وَإِنْ اشْتَكَى رَأْسُهُ اشْتَكَى كُلُّهُ অর্থ: সব মুসলিম এক ব্যক্তির ন্যায়। যদি তার চোখ অসুস্থ হয় তবে তার সারা দেহেই তার বেদনা ছড়িয়ে পড়ে; আর যদি তার মাথা অসুস্থ হয় তবে তার সারা দেহই অসুস্থ হয়ে পড়ে। (সহীহ্ মুসলিম, অধ্যায় : আল-বির্ ওয়া আল-সিলাহ ওয়া আল-আদাব)।

বস্তুত সমাজে বসবাসকারী সমস্ত মুসলিম পরস্পর ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ। সুতরাং মুসলিমদের পারস্পরিক আচরণ হবে ভ্রাতৃসুলভ। একে অন্যের বিপদে এগিয়ে আসবে, অসুস্থ হলে সেবা করবে, আহ্বান করলে সাড়া দেবে, মারা গেলে জানাযায় শরীক হবে। মুসলিমগণ পরস্পর সদাচরণ করবে, সুসম্পর্ক বজায় রাখবে, কারো কোনরূপ অনিষ্ট করবে না; জীবন সম্পদ ও সম্ভ্রমের হানি করবে না, অত্যাচার নিপীড়ন করবে না। বরং নিজের উপর অন্য মুসলিম ভাইয়ের অধিকারকে প্রাধান্য দেবে।

অমুসলিমদের প্রতি কর্তব্য

সমাজে মুসলিমদের পাশাপাশি অমুসলিমগণও বসবাস করে থাকেন। ইসলাম ধর্মে তাদের প্রতিও সদাচরণের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। তাদেরকে বিপদে আপদে সাহায্য করা, সহানুভূতি জানানো ইসলামের অন্যতম আদর্শ। রাসূল (স.) ও সাহাবায়ে কিরাম নিজেদের জীবনে এরূপ অসংখ্য নজীর স্থাপন করে গেছেন। অমুসলিমদের সাথে ভাল ব্যবহার করতে হবে, তাদের উপর কোনরূপ অত্যাচার করা যাবে না, তাদের ধর্ম স্বাধীনভাবে পালনে কোন বাঁধা দেয়া যাবে না, ইসলাম গ্রহণের জন্য তাদের উপর জোর জবরদস্ড়ি করা যাবেনা। আল-াহ তা'আলা বলেন- لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ অর্থ: দীন গ্রহণে কোন জোর জবরদস্ড়ি নেই। (আল-কুরআন, ২ : ২৫৬)

প্রকৃতপক্ষে অমুসলিমদের সাথে উদার ও মানবিক ব্যবহার করতে হবে। সহনশীলতা, ধৈর্য, ক্ষমা, পরমতসহিষ্ণুতা, পারস্পরিক সহাবস্থান ইত্যাদি আদর্শ বাস্তবায়ন করা ইসলামী সমাজ জীবনের অন্যতম আদর্শ।

অর্থনৈতিক জীবনে ইসলাম

অর্থনীতি মানবজীবনের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। ইসলাম পূর্ণাঙ্গ দীন। তাই মানুষের অর্থনৈতিক জীবনের নানা সমস্যারও সমাধান ইসলামী অর্থব্যবস্থায় রয়েছে। ইসলামী অর্থনীতি হলো- সমাজ বিজ্ঞানের একটি শাখা যা ইসলামের আলোকে মানুষের যাবতীয় অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান করে থাকে।

ইসলামী অর্থব্যবস্থা কতগুলো মূলনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। নিম্নে ইসলামী অর্থনীতির উল্লেখযোগ্য কতিপয় মূলনীতি আলোচিত হল-

১. **সম্পদের মালিকানা :** ইসলামী অর্থনীতিতে সমস্ত সম্পদের প্রকৃত মালিক একমাত্র আল্লাহ তা'আলা। আল কুরআনে বর্ণিত হয়েছে- لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ অর্থ: আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে আল্লাহরই আধিপত্য। (আল-কুরআন, ৪২: ৪৯)

২. **ব্যক্তিমালিকানা :** ইসলামে ব্যক্তি মালিকানাও স্বীকৃত। এ পৃথিবীতে সমস্ত সম্পদ ব্যবহারের মালিক মানুষ। প্রকৃত মালিক আল-াহর খলীফা হিসেবে মানুষ এ ব্যক্তি মালিকানা সাময়িকভাবে লাভ করে থাকে।

৩. **অর্থনৈতিক নিরাপত্তা :** ইসলামে সমাজের প্রতিটি মানুষের অর্থনৈতিক অধিকার সংরক্ষিত। এমনকি অক্ষম, অচল ও বৃদ্ধ যারা কার্যক্ষম নয় তারাও সরকারিভাবে আর্থিক ভাবে নিরাপত্তা প্রাপ্ত।

৪. **উপার্জন পদ্ধতি :** ইসলাম যেকোন উপায়ে অর্থ উপার্জনের অনুমতি প্রদান করেনি। বরং যে সমস্ড় কাজ শরী'আতে অবৈধ কিংবা যে সব কাজ মানবকল্যাণ বিরোধী সে সব কাজের মাধ্যমে অর্থোপাজন ইসলামে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। মহানবী (স.) বলেছেন- 'যে ব্যক্তি অন্যায়ভাবে কারো এক বিঘত জমিও গ্রাস করবে। কিয়ামতের দিন তার গলায় সাত তবক জমিন লটকিয়ে শাস্তি দেয়া হবে।' (সহীহ্ বুখারী, অধ্যায় : আল-মাযালিম ওয়া আল-গাসাব)

৫. **সুদ নিষিদ্ধ :** ইসলামী অর্থনীতির অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো এটি সুদমুক্ত অর্থব্যবস্থা। এতে সুদের কোনরূপ স্থান নেই। আল্লাহ তা'আলা বলেন- وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا অর্থ: আল্লাহ ব্যবসাকে হালাল এবং সুদকে হারাম করেছেন। (আল-কুরআন, ২ : ২৭৫)

৬. **আর্থিক দুর্নীতি নিষিদ্ধ :** অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে যে কোন প্রকারের অনিয়ম, অত্যাচার ও দুর্নীতি ইসলামে নিষিদ্ধ। যেমন- কালোবাজারী, মজুদদারী, ওজনে কম দেয়া, মিথ্যা প্রতারণার আশ্রয় নেয়া, ঘুষ, মুনাফাখোরী, ভেজাল মিশ্রণ, অন্যায় জবর-দখল ইত্যাদি সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ।

৭. **যাকাত ব্যবস্থা চালু :** ইসলামী অর্থনীতি যাকাত ভিত্তিক অর্থনীতি। এতে সরকারি ব্যবস্থাপনায় সারাদেশ হতে যাকাত উত্তোলন করা হয় এবং পরিকল্পিত উপায়ে দারিদ্র বিমোচনের জন্য নির্দিষ্ট খাতে এ অর্থ ব্যয় করা হয়।

৮. **অপচয়-অপব্যয় নিষিদ্ধ :** ইসলাম আর্থিক ক্ষেত্রে সবধরনের অপব্যয় ও অপচয় অবৈধ ঘোষণা করেছে। আল্লাহ বলেছেন- إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ অর্থ: নিশ্চয়ই আপচয়কারীরা শয়তানের ভাই। (আল-কুরআন, ১৭ : ২৭)

৯. **সম্পদের সুষম বণ্টন :** ইসলামী অর্থব্যবস্থায় সম্পদ সুষ্ঠুভাবে সবার মধ্যে বিতরণ করা হয়। এতে কেউ সম্পদের পাহাড় জমাবে আর কেউ নিঃস্ব হতদরিদ্র অবস্থায় থাকবে তা হতে পারে না। বরং সকলেই নিজ নিজ প্রয়োজন ও যোগ্যতা অনুযায়ী সম্পদ লাভ করবে। সম্পদের বৈষম্য এ অর্থব্যবস্থায় প্রকট আকার ধারণ করতে পারে না।

১০. **মানবকল্যাণ :** সর্বোপরি ইসলামী অর্থনীতি মানব কল্যাণের উপর প্রতিষ্ঠিত। মানব জাতির অকল্যাণ হয় এমন লাভজনক কাজও এ অর্থনীতি অনুমোদন করে না। বরং মানব কল্যাণের লক্ষ্যে শরী'আত সম্মত যে কোন কাজই এ অর্থনীতির প্রধান উপজীব্য।

রাজনৈতিক জীবনে ইসলাম

রাজনৈতিক জীবনের নানা সমস্যাতেও ইসলাম পূর্ণাঙ্গ বিধান প্রণয়ন করেছে। ইসলামী আদর্শে রাষ্ট্র পরিচালনা হলো একটি বিশেষ নি'আমত। এটি মহান আল-াহর দান। সুতরাং ইসলামী রাজনৈতিক চিন্ড়াধারা ও রাষ্ট্রীয় কাঠামো সম্পূর্ণ ভিন্নতর। মানব রচিত এবং প্রচলিত নানা মতবাদ বা ধারণার সাথে মৌলিক অনেক বিষয়ে এর বৈসাদৃশ্য রয়েছে। আল-াহ প্রদত্ত রাজনৈতিক আদর্শই ইসলামী রাজনীতির মূলকথা।

সাধারণভাবে ইসলামী রাষ্ট্রকে বলা হয় খিলাফত আর এর প্রধানকে বলা হয় খলীফা। খিলাফাত হলো ইসলামী আইন, কানুন ও আদর্শের দ্বারা পরিচালিত রাষ্ট্র ব্যবস্থা। রাসূলুল্লাহ (স.)-এর মদীনা রাষ্ট্র এবং তৎপরবর্তী খুলাফায়ে রাশেদীনের ইসলামী রাষ্ট্র খিলাফাত ধারণার প্রধান উদাহরণ।

ইসলামী রাষ্ট্র বা খিলাফাতের কতিপয় মূলনীতি ও বৈশিষ্ট্য হলো-

১. **আল-াহর সার্বভৌমত্ব :** ইসলাম মতে সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী একমাত্র আল-াহ পাক। আল কুরআনে বর্ণিত হয়েছে, قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ– অথ: বলুন, হে আল-াহ! আপনি সমস্ড় রাজ্যের মালিক। আপনি যাকে ইচ্ছা রাজ্য দান করেন, আবার যার নিকট হতে ইচ্ছা রাজ্য ছিনিয়ে নেন। (আল-কুরআন, ৩ : ২৬)

২. কল্যাণমূলক রাষ্ট্র : ইসলামী খিলাফাত জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্র। জনগণের কল্যাণ ব্যতীত কোনরূপ কাজ এ রাষ্ট্রের ব্যবস্থায় বৈধ বলে বিবেচিত হয় না।

৩. শরী'আত বা ইসলামী আইনের প্রচলন।

৪. জনপ্রতিনিধিত্বমূলক শাসন ব্যবস্থা।

৫. যোগ্যতমের শাসন।

৬. নাগরিকদের মৌলিক অধিকারের সংরক্ষণ।

৭. জবাবদিহি ও ব্যক্তি স্বাধীনতার চর্চা।

৮. শাসক বা খলীফা জনগণের প্রভু নয় বরং সেবক।

৯. পরামর্শ ভিত্তিক শাসন ব্যবস্থা।

১০. সর্বোপরি রাষ্ট্রীয় সকল ক্ষেত্রে আল্লাহ তা'আলা ও তদীয় রাসূল (স.) প্রদর্শিত দীন ইসলামের আদর্শের প্রতিফলন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন: ১৫.৩

নৈর্ব্যক্তিক উত্তর প্রশ্ন

এক কথায় উত্তর দিন

১. কাদের মাধ্যমে পরিবারের উৎপত্তি হয়?
২. আশে পাশের কত ঘর পর্যন্ত প্রতিবেশী?
৩. মুসলিম পরস্পর কি বন্ধনে আবদ্ধ?
৪. ইসলাম ধর্মে সার্বভৌমত্ব একমাত্র কার অধিকারে স্বীকৃত?
৫. অপচয়কারী কার ভাই হিসেবে চিহ্নিত?

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১. ইসলামী পরিবারের পরিচয় দিন।
২. মাতাপিতার প্রতি সন্তানের দায়িত্ব ও কর্তব্য আলোচনা করুন।
৩. প্রতিবেশীর প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য বিশ্লেষণ করুন
৪. মুসলিমদের পারস্পরিক দায়িত্বের বর্ণনা দিন।
৫. ইসলামী অর্থনীতির মূলনীতিসমূহ উল্লেখ করুন।
৬. ইসলামী রাজনৈতিক ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যাবলী লিপিবদ্ধ করুন।

রচনামূলক প্রশ্ন

১. পারিবারিক জীবনে ইসলামের বিধান আলোচনা করুন।
২. সামাজিক শান্ড়ি প্রতিষ্ঠায় ইসলামের ভূমিকা বর্ণনা করুন।
৩. ইসলামী অর্থনীতি সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে বিবরণ দিন।
৪. ইসলামের রাজনৈতিক আদর্শ বিশ্লেষণ করুন।

পাঠ-৪: বাংলাদেশে ইসলামের আগমন

উদ্দেশ্য

এ পাঠ করে আপনি

- বাংলাদেশে ইসলামের আগমন সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন।
- বাংলাদেশে ইসলাম ধর্ম প্রচারের প্রাথমিক অবস্থা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- বাংলাদেশে ইসলাম ধর্মের আগমনের পিছনে যেসব মনীষীর অবদান রয়েছে তাঁদের জীবনাদর্শ সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিতে পারবেন।

ইসলামের আগমন ও বাংলাদেশ

বর্তমান বাংলাদেশ স্বাধীনতাপূর্ব সময় হতেই মুসলিম প্রধান দেশ। এমনকি এর পূর্বতন রূপ পূর্বপাকিস্তান অঞ্চলটিও মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে সৃষ্ট। সুতরাং এ অঞ্চলে ইসলামের আগমন জানার জন্য বাংলাদেশের প্রাচীন ইতিহাস পর্যালোচনা করা আবশ্যক।

ইসলামের আবির্ভাবের সময়টিতে এ অঞ্চলটি বঙ্গ বা বাংলা নামে পরিচিত ছিল। সে সময় বাংলা বা বঙ্গ অঞ্চলের সীমানা শুধু বর্তমান বাংলাদেশ এর সীমানা দ্বারাই বেষ্টিত ছিল না। বরং তৎকালীন বঙ্গদেশের সীমানা ছিল বেশ বিস্তৃত। ঐতিহাসিক মতে- প্রাচীন যুগে বাংলা ছিল প্রায় ৮০,০০০ বর্গমাইল বিস্তৃত এক বিশাল সমভূমি। এর পূর্বে ত্রিপুরা, গারো ও লুসাই পর্বতমালা, উত্তরে শিলং মালভূমি ও নেপালের তারাই অঞ্চল, পশ্চিমে রাজমহল ও ছোট নাগপুর পর্বতরাজির উচ্চভূমি এবং দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর। বস্তুত এ বিশাল বাংলা অঞ্চলে কোন সময় ইসলামের আগমন ঘটে তা সুনির্দিষ্টভাবে নির্ধারণ করা যায় না। তবে ঐতিহাসিকগণ নানা তথ্য উপাত্তের আলোকে বঙ্গ অঞ্চলে ইসলামের আগমনকাল সম্পর্কে নানা মত প্রকাশ করেছেন।

বাংলা বিজয়

একথা সর্বসম্মত যে, বাংলায় ইসলামের রাজকীয় অনুপ্রবেশ ঘটে ইখতিয়ার উদ্দীন মুহাম্মদ ইবন বখতিয়ার খিলজী এর বাংলা বিজয়ের মাধ্যমে। খ্রিস্টীয় ১২০৪ সালে ইখতিয়ার উদ্দীন মুহাম্মদ তৎকালীন বাংলার সেন বংশীয় রাজা লক্ষণ সেনকে পরাজিত করে ইসলামের বিজয়কেতন উড্ডীন করেন। বখতিয়ার বিজিত এ রাজ্যের সীমানা ছিল- উত্তরে বর্তমান পশ্চিম বঙ্গের অন্তর্ভূক্ত পূর্ণিয়া শহর হয়ে দেবকোট থেকে রংপুর শহর, পূর্বে ও দক্ষিণ-পূর্বে তিস্তা ও করতোয়া, দক্ষিণে গঙ্গার মূলধারা বা পদ্মা এবং পশ্চিমে কুশী নদীর নিম্নাঞ্চল থেকে গঙ্গার কিনারায় রাজমহল পাহাড় পর্যন্ত বিস্তৃত। ইখতিয়ার উদ্দিন মুহাম্মদের এ বিজয়ের ফলে বাংলায় ইসলাম ব্যাপকভাবে পরিচিত ও প্রচারিত হয়। এ সময় হতে দলে দলে মুসলিমগণ বাংলায় এসে বসতি স্থাপন করেন এবং ইসলাম প্রচারকার্য শুরু করেন। এভাবেই বাংলা অঞ্চলে ইসলামের আগমন ঘটে বলে অনেক ঐতিহাসিক মনে করে থাকেন।

ইসলামের আগমন

ঐতিহাসিকদের অপর একদলের মতে- বাংলাদেশে ইসলামের আগমন ঘটে ইখতিয়ার উদ্দীন মুহাম্মদের বাংলা বিজয়ের অনেক পূর্বে। তাঁদের মতে- এদেশে খ্রিষ্টীয় সপ্তম শতক হতে দশম শতকের মধ্যেই ইসলামের প্রবেশ ঘটে এবং ধীরে ধীরে তা প্রসারিত হয়।

তাঁদের মতে- এদেশে ইসলামের আগমন ঘটে প্রধানত দু'টি মাধ্যমে। আর এ দুটি হলো- ব্যবসা-বানিজ্য এবং ধর্মপ্রচার। নানা যুক্তির মাধ্যমে ঐতিহাসিকগণ প্রমাণ করেছেন যে এতদুভয় মাধ্যমের দ্বারা ১২০৪ খ্রিস্টাব্দের অনেক পূর্বেই বাংলায় ইসলামের সূচনা ঘটে। নিম্নে বাংলাদেশে ইসলামের আগমনের এ দুটো মাধ্যম প্রসঙ্গে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেয়া হলো-

১. ব্যবসা-বাণিজ্য

ঐতিহাসিকণের মতে বাংলায় ইসলাম আগমনের সর্বপ্রধান মাধ্যম ছিল আরব-ভারত-চীন বাণিজ্য সম্পর্ক। জাহিলিয়াতের যুগ হতেই আরব বণিকগণের সাথে এ অঞ্চলের বাণিজ্য সম্পর্ক প্রচলিত ছিল। রাসূল (স.) ভারতীয় সুগন্ধি দ্রব্য উপহার হিসেবে লাভ করেন বলেও প্রমাণ পাওয়া যায়। ভুগোলবিদগণ আরব-ভারত-চীন বাণিজ্য পথের নানা বর্ণনা লিপিবদ্ধ করে গেছেন। তাঁদের দেয়া তথ্য মতে, আরব-চীন বাণিজ্য যাত্রার মূলসুত্র ছিল ভারতবর্ষ। আরব বণিকগণ পারস্য উপসাগর হয়ে বেলুচিস্তানের একটি বন্দরে প্রবেশ করতেন। তারপর একে একে সিন্ধু, গুজরাট, মাদ্রাজ ও কলকাতা বন্দরে প্রবেশ করে বঙ্গোপসাগরে উপনীত হত। তারা এ সময় এ অঞ্চলের সিলাহাত বা বর্তমান সিলেট ও সাদজাম বা বর্তমান চট্টগ্রাম বন্দরে যাত্রাবিরতি করতেন। এরপর তারা চীন সাগরে প্রবেশ করত। এভাবেই আরব হতে চীন পর্যন্ত বণিজ্য যাত্রায় ভারত উপমহাদেশ ও বঙ্গদেশ বেশ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করত। আরবগণ মধ্যবর্তী এসব বন্দরেও তাঁদের ব্যবসা-বণিজ্য পরিচালনা করতেন ও সফরের প্রয়োজনীয় সরাঞ্জাম সংগ্রহ করতেন।

আরব ঐতিহাসিক ও ভূগোলবিদদের বর্ণনায়ও বাংলার নানা স্থানের উল্লেখ পাওয়া যায়। ভূগোলবিদ ইবন খুরদাদবিহ তাঁর বর্ণনায় বাংলাদেশের চাঁদপুর নদীবন্দরের উল্লেখ করেছেন। আল ইদ্রীসীর বর্ণনায় রয়েছে- বাগদাদ ও বাসরাহ থেকে আরব বণিক এবং পর্যটকগণ মেঘনার মোহনার সন্নিকটস্থ অঞ্চলে আসা যাওয়া করতেন। এছাড়া আল মাসউদী, ইয়াকুত ইবন আব্দুল্লাহ, প্রমুখের বর্ণনাতেও আরব-চীন বাণিজ্য পথে বঙ্গদেশের উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায়।

বস্তুত মহানবী (স.) এর নবুওতপূর্ব বহুকাল ধরেই আরব ভারত-চীন বাণিজ্য সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল। ইসলামের আবির্ভাবের পরও এ সম্পর্ক অব্যাহত ছিল। আরব-মুসলিম বণিকগণ তৎকালে এ পথ ধরেই বাণিজ্য যাত্রা অব্যাহত রাখেন। ফলে ইসলামের আবির্ভাবের অল্প কালের মধ্যেই ভারতবর্ষ তথা বাংলাদেশে ইসলামের আগমন ঘটে। বাণিজ্য উপলক্ষে আগমন করলেও আগত এসব আরব মুসলিম বণিক এদেশের জনগণের মধ্যেও ইসলাম প্রচারের সুযোগ হাতছাড়া করেননি। তাঁরা যেসব বন্দরে যাত্রাবিরতি করতেন সেখানেই ইসলামের প্রচার করতেন। এভাবে খ্রিষ্টীয় অষ্টম শতকেই বাংলাদেশে ইসলামের অনুপ্রবেশ ঘটে।

২. ধর্মপ্রচার

বাংলাদেশে ইসলামের প্রবেশের প্রধানতম মাধ্যম ছিল মুসলিমদের ধর্মপ্রচার। মুসলিমগণ ধর্মপ্রচারকে নিজ নিজ ধর্মীয় কর্তব্য হিসেবে পালন করেন। তাদের নিকট ইসলামকে অমুসলিমের নিকট পৌঁছে দেয়া ও এ লক্ষ্যে কষ্ট পরিশ্রম স্বীকার করা ছিল গৌরবের কাজ। এজন্য দেখা যায় রাসূল (স.) এর নবুওত প্রাপ্তির পর হতেই ইসলাম প্রচারের কাজ শুরু হয়। মহানবীর (স.) ইন্তিকালের পর এ দায়িত্ব মুসলিমদের উপর আরও ভালভাবে অর্পিত হয়। সাহাবীগণ এসময় ইসলামের দাওয়াত নিয়ে দিকদিগন্তে ছড়িয়ে পড়েন।

ঐতিহাসিকদের ধারণা মতে- সাহাবীদের একটি দল সর্বপ্রথম ইসলামের প্রচার করার জন্য ভারত ও বাংলাদেশে আগমন করেন। আর তাঁদের মাধ্যমেই এদেশে ইসলামের সূচনা ঘটে। যেহেতু আরব-চীন বাণিজ্য সম্পর্ক বহু প্রাচীনকাল হতেই প্রচলিত ছিল। সেহেতু ভারত উপমহাদেশে সাহাবীদের আগমন অস্বাভাবিক ছিল না। ধারণা করা হয়- রাসূল (স.) এর মামা সাহাবী আবু ওয়াক্কাস মালিক ইবন ওয়াহাব (রা.) আনুমানিক ৬১৭ খিস্টাব্দে তাঁর কতিপয় সাথীসহ ইসলামের প্রচারের জন্য চীনের উদ্দেশ্যে দুটি জাহাজ নিয়ে রওয়ানা হন। এ যাত্রায় কায়স ইবন হুযাইফা (রা.), উরওয়াহ ইবন আছাছা (রা.), আবু কায়স ইবন হারিছ (রা.) প্রমুখ সাহাবী তাঁর সাথে ছিলেন। তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল চীনে ধর্মপ্রচার করা। এ লক্ষ্যে তাঁরা আরব ও চীনের মধ্যবর্তী ভারতীয় বন্দরসমূহে অবতরণ করেন। তাঁরা সেসব বন্দরে অবস্থান কালে ইসলাম প্রচার করেন। শাইখ যাইনুদ্দীন স্বীয় তুহফাতুল মুজাহিদীন গ্রন্থে ভারতের নানা বন্দরে এরূপ একদল আরবের ইসলাম প্রচারের বর্ণনা উপস্থাপন করেছেন। এ সফরে সাহাবীগণ বাংলাদেশের বন্দরেও নোঙ্গর করেছিলেন। কেননা সফরের রসদ ও প্রয়োজনীয় সামগ্রী সংগ্রহের জন্য তৎকালে এসব বন্দরে অবতরণের কোন বিকল্প ছিল না। সুতরাং ধরে নেওয়া যায় যে, সাহাবীগণ বাংলাদেশেও ইসলাম প্রচারের সূচনা করে গিয়েছিলেন। তাঁদের দাওয়াতে সে সময় এদেশের কেউ ইসলাম গ্রহণ করেছিল কিনা তা স্পষ্টভাবে জানা যায় না। তবে তাঁদের দাওয়াতে এদেশের জনগণ যে ইসলামের পরিচয় লাভ করেছিল তা নিশ্চিতরূপেই বলা যায়।

৭১২ খ্রিস্টাব্দে মুহাম্মদ ইবন কাসিমের সিন্ধু বিজয় গোটা ভারতবর্ষে ইসলাম প্রচারের পথ উন্মুক্ত করে। এরই ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশেও বহু মুসলিম মুবালি-গ ধর্মপ্রচারের জন্য আগমন করেন। এসময় মাহমুদ ও মুহায়মিন এর নেতৃত্বে একদল ধর্ম প্রচারক এদেশে আগমন করেন বলে জানা যায়। পরবর্তীতে হযরত হামিদ উদ্দীন (রা.), হযরত হোসেন উদ্দীন, হযরত মর্তুজা, হযরত আব্দুল্লাহ, হযরত আবু তালিব প্রমুখ ইসলাম প্রচারের জন্য এদেশে আগমন করেন। শেষ পর্যায়ে ইখতিয়ার উদ্দীন মুহাম্মদ ইবন বখতিয়ার খিলজী কর্তৃক বাংলা বিজয়ের মাধ্যমে এদেশে ধর্ম প্রচারকদের ব্যাপকহারে আগমন ঘটে। মূলত এভাবেই বাংলাদেশে ইসলামের আগমন ঘটে।

পাঠোত্তর মূল্যায়নঃ ১৫.৪

নৈর্ব্যক্তিক উত্তর প্রশ্ন

এক কথায় উত্তর পশ্ন

১. বাংলাদেশে মুসলিম বিজয়ের সেনাপতি কে ছিলেন?
২. কত খ্রিস্টাব্দে মুসলিমগণ রাজকীয়ভাবে বাংলায় প্রবেশ করেন?
৩. বাংলাদেশে ইসলাম অনুপ্রবেশ করে কতটি মাধ্যমে?
৪. আরব-চীন বাণিজ্য পথে অবস্থিত বাংলাদেশের একটি বন্দরের নাম লিখুন।
৫. বাংলাদেশে কোন সাহাবী আগমন করেছিলেন বলে ধারণা করা হয়?
৬. মুহাম্মদ ইবনে কাসিম কত খ্রিস্টাব্দে সিন্ধু বিজয় করেন?

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১. ধর্মপ্রচার উপলক্ষ্যে বাংলাদেশে আগত মুসলিমদের নাম লিখুন।
২. প্রাচীন বাংলার সীমারেখা উল্লেখ করুন ।
৩. আরব-ভারত-চীন বাণিজ্যপথের বিবরণ লিখুন।

রচনামূলক প্রশ্ন

১. বাংলাদেশে ইসলাম ধর্মের আগমন সম্পর্কে সবিস্তারে আলোচনা করুন।

পাঠ-৫: বাংলাদেশে ইসলামের বিকাশ

উদ্দেশ্য

এ পাঠ করে আপনি

- বাংলাদেশে ইসলাম ধর্ম প্রচার ও প্রসার সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন।
- বাংলাদেশে মুসলিম জনগোষ্ঠীর সংখ্যাগরিষ্ঠতার কারণ ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- বাংলাদেশে ইসলাম ধর্মের ক্রমবিকাশ সম্পর্কে প্রচলিত নানা মতবাদ ও তত্ত্ব সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন।

বাংলাদেশে ইসলামের ক্রমবিকাশ

খ্রিস্টীয় সপ্তম শতক হতে দশম শতাব্দীর মধ্যে বাংলাদেশে ইসলামের অনুপ্রবেশ ঘটে। পরবর্তীতে ইখতিয়ার উদ্দীন মুহাম্মদ ইবন বখতিয়ার খিলজী কর্তৃক বাংলা বিজয়ের মাধ্যমে এদেশে ইসলাম বিজয়ী বেশে প্রবিষ্ট হয়। কিন্তু সে সময়ই ইসলাম এদেশে বিপুলভাবে সম্প্রসারিত হয়নি। জনসাধারণের অসহযোগিতা, প্রতিকূল প্রাকৃতিক পরিবেশ, যোগাযোগ ও যাতায়াত অবকাঠামোর হীনাবস্থা, সর্বোপরি গোটাবিশ্বেই মুসলিমদের সংখ্যাল্পতা তৎকালীন সময়ে বাংলায় ইসলাম প্রচারের পথে বাঁধা হিসেবে দাড়িয়েছিল। পরবর্তীতে ক্রমান্বয়ে এসব বাঁধা অপসারিত হয় এবং বাংলায় ইসলামের বিকাশ ঘটতে থাকে। ফলশ্রুতিতে এদেশে মুসলিমদের সংখ্যা বৃদ্ধি পায় এবং একপর্যায়ে মুসলিমগণ এদেশে সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। ইসলামের এ ব্যাপক বিকাশ ও মুসলিমগণের এ বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা সর্বপ্রথম প্রকাশিত হয় ১৮৭২ সালে। এ সময় বাংলাদেশে প্রথম আদমশুমারী পরিচালিত হয়। ফলে এ অঞ্চলটি বিশ্বের অন্যতম প্রধান মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চল হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে।

আদমশুমারী ফলাফল প্রত্যক্ষ করে ঐতিহাসিকগণ এদেশে ইসলামের ক্রমবিকাশ ও মুসলিম জনসংখ্যার সংখ্যাগরিষ্ঠতার কারণ অনুসন্ধানে ব্রতী হন। নানা তথ্য-উপাত্ত ও ঐতিহাসিক বিশে- ষণের মাধ্যমে গবেষকগণ বাংলাদেশে ইসলামের প্রচার, প্রসার ও বিকাশের ক্ষেত্রে কতিপয় কারণ উপস্থাপন করেন। উলে- খযোগ্য কয়েকটি নিম্নে উপস্থাপন করা হলো:

ক. রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতা
খ. অভিবাসন
গ. প্রচারণা
ঘ. সামাজিক মুক্তি
ঙ. সাংস্কৃতিক মধ্যস্থতাকারী
চ. সীমান্ড়
ছ. আঞ্চলিক সুবিধা

বাংলাদেশে ইসলাম ধর্মের বিকাশ, বৌদ্ধ ও হিন্দু ধর্ম হতে ইসলাম ধর্মে ব্যাপক ধর্মান্ড়রকরণ প্রক্রিয়ার কারণ বিশে- ষণে এ কারণগুলো বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। নিম্নে এসব মতবাদ ও তত্ত্বের সংক্ষিপ্ত বিবরণ তুলে ধরা হলো-

রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতা

রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতার কারণে বাংলাদেশে ইসলামের বিকাশ ঘটেছিল। বাংলায় ইসলাম যখন রাজশক্তি হিসেবে বিজয় লাভ করে তখন এখানকার শাসক গোষ্ঠীর আনুকূল্য ও পার্থিব সুযোগ-সুবিধা লাভের জন্য এদেশীয় অমুসলিমগণ দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করে। তাছাড়া মুসলিম রাজশক্তি ও শাসকদের পৃষ্ঠপোষকতায় বহুল পরিমাণে মসজিদ, মাদ্রাসা, খানকাহ, ইত্যাদি স্থাপিত হয়। বিপুলসংখ্যক মুবাল্লিগ ও মুসলিম এদেশে বসতি স্থাপন করেন। ফলে এসব কারণে এদেশে ইসলামের ব্যাপক প্রসার ঘটে।

প্রকৃতপক্ষে, রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতা এদেশে ইসলাম প্রচারে ব্যাপক ভূমিকা পালন করেছিল। কিন্তু রাজশক্তির নির্যাতনের ভয়ে কিংবা আনুকূল্য লাভের আশায় জনগণের ইসলাম গ্রহণের বিষয়টি সর্বাংশে সত্য নয়। কেননা রাজশক্তির প্রভাবে ধর্মান্তরকরণ হলে গোটা ভারতবর্ষে দিল্লী অঞ্চলেই বেশি মানুষ মুসলিম হওয়ার কথা। কেননা তৎকালে দিল্লীই ছিল মুসলিম শাসনের কেন্দ্রস্থল। সুতরাং যৌক্তিক দিক হতেও রাজশক্তির প্রভাবে ধর্মান্তরকরণের বিষয়টি পূর্ণাঙ্গ নয় বলেই প্রতীয়মান হয়।

অভিবাসন

আবু এ গজনভি ও খন্দকার ফজলে রাব্বি প্রমুখ গবেষকগণের মতে, বাংলায় ইসলামের ব্যাপক প্রসারের মূল কারণ ছিল অভিবাসন। মুসলিমদের বাংলা বিজয়ের পর হতেই এদেশে উল্লেখযোগ্য হারে অভিবাসী মুসলিমদের আগমন ঘটতে থাকে। বিশেষ করে আরব, ইরান ও মধ্য এশিয়া হতে বিপুল সংখ্যক মুসলিম এদেশে বসতি স্থাপন করেন। তাঁরা একদিকে ইসলাম

ধর্ম প্রচার করেন, অন্যদিকে স্থানীয় পর্যায়ে বিবাহ শাদীর মাধ্যমে এদেশে মুসলিম জনসংখ্যার ব্যাপক বৃদ্ধিতেও অবদান রাখেন। বর্তমানকালের এ বিশাল মুসলিম জনগোষ্ঠীর একটি বিরাট অংশ এসব অভিবাসী মুসলিমদেরই বংশধর বলে গবেষকদ্বয় উল্লেখ করেন।

সামাজিক মুক্তি

বাংলাদেশে ইসলামের ক্রমবিকাশের কারণ বিশ্লেষণে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কারণ হলো সামাজিক মুক্তি। হেনরি রেভারলিসহ আরো বহু গবেষক বাংলাদেশে ইসলামের প্রসারে এ বিষয়টির কার্যকারিতা সমর্থন করেন। এর আলোকে বুঝা যায় সামাজিক শৃঙ্খল হতে মুক্তির উপায় হিসেবে এদেশের জনগণ গণহারে ইসলাম গ্রহণ করে।

প্রকৃতপক্ষে, ইসলাম আগমনের পূর্বে এদেশে হিন্দু ধর্মের ব্যাপক প্রভাব বিদ্যমান ছিল। বিশেষকরে সেন বংশের শাসনামলে এ সময় এ অঞ্চলে হিন্দু জাতিভেদ ও বর্ণাশ্রম প্রথা কঠোরভাবে সামাজিক বৈষম্য সৃষ্টি করে। ফলে সমাজের বৃহৎ জনগোষ্ঠী ধর্মীয় ও সামাজিক অধিকার হতে বঞ্চিত হয়ে পড়ে। নিম্নশ্রেণীর হিন্দুরা দারুণভাবে নির্যাতিত হয়। এমতাবস্থায় এদেশে ইসলামের অনুপ্রবেশ ঘটে। ফলে ইসলামের সাম্য ও মৈত্রীর বাণীতে উদ্বুদ্ধ হয়ে সামাজিক মুক্তির লক্ষ্যে দলে দলে লোক ইসলাম গ্রহণ করে। আর এভাবেই ইসলামের উদার ও ভ্রাতৃত্বের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে এদেশে মুসলিম জনসংখ্যা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেতে থাকে।

প্রচারণা

বাংলাদেশে ইসলামের ক্রমবিকাশের সর্বপ্রধান কারণ হলো- ইসলাম ধর্মের ব্যাপক প্রচারণা। এদেশে ইসলাম প্রচারে সর্বপ্রধান ভূমিকা পালন করেন- পীর, সুফি-সাধক, ফকির-দরবেশ, মুবাল্লিগ ও আলেমগণ। তাদের দ্বারা মুসলিম বিজয়ের পূর্বেই এদেশে ইসলামের প্রচার কার্য শুরু হয় এবং অদ্যাবধি এ প্রচারকার্য পরিচালিত হচ্ছে। পীর-মাশায়েখের অক্লান্ড় পরিশ্রম ও ঐকান্ড়িক প্রচেষ্টায় এদেশে ক্রমান্বয়ে ইসলাম জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। এসব প্রচারকগণ জোরজবরদস্ড়ি বা বলপ্রয়োগের মাধ্যমে ইসলাম প্রচারে বিশ্বাসী ছিলেন না। বরং প্রেম, ভালবাসা, সাম্য-মৈত্রী ও ভ্রাতৃত্বের উদার শিক্ষার মাধ্যমে তাঁরা এ অঞ্চলে ইসলাম প্রচার করেন।

সাধারণত কোন অঞ্চলে সুফি-সাধকদের একটি খানকাহ থাকত। এর সাথে মসজিদ, মাদ্রাসাও প্রতিষ্ঠিত হত। এসব প্রতিষ্ঠানকে কেন্দ্র করে সুফিগণ তাঁদের আদর্শ ও ধর্ম প্রচার করতেন। ফলে ঐ অঞ্চল ক্রমান্বয়ে ইসলাম প্রচার ও শিক্ষা কেন্দ্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। প্রাচীন বাংলার এসব কেন্দ্রের মধ্যে শ্রীহট্ট, সোনারগাঁ, পান্ড়ুয়া ইত্যাদি ছিল অন্যতম। এসব কেন্দ্র হতে পরবর্তীকালে সারা বাংলায় ইসলামের ব্যাপক প্রচার ও প্রসার ঘটে।

সাংস্কৃতিক মধ্যস্থতাকারী

গবেষক অসীম রায় সহ অনেক ঐতিহাসিক, গবেষক মনে করেন, বাংলায় গণইসলামীকরণের কারণ হিসেবে এবং বাংলায় মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠতার পেছনে দু'ধরণের মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকা অনস্বীকার্য।

প্রথমত, পীর-দরবেশ ও সুফি-সাধকগণ। তাঁরা বিরোধ মীমাংসা, শান্ড়ি-শৃঙ্খলা স্থাপনকারী ও আর্থ-সামাজিক কর্মকান্ডের মধ্যস্থতাকারী হিসেবে সমাজে সম্মানিত ও গ্রহণীয় ছিলেন। তাঁদের উদার দৃষ্টিভঙ্গী ও ন্যায়বিচার এদেশে ইসলামকে জনপ্রিয় করে তোলে। দ্বিতীয়ত, বাংলার আদি লেখকশ্রেণী। তাঁরা বাংলার দেশীয় সংস্কৃতির সাথে ইসলামী সংস্কৃতির মিলন ঘটিয়ে এদেশে ইসলামকে গ্রহণযোগ্য করে তোলেন। বাংলাভাষায় আরবী, ফার্সী, উর্দু শব্দের ব্যবহারের মাধ্যমেও তাঁরা এ অঞ্চলে ইসলামের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি করেন। মূলত এ দু'শ্রেণীর মানুষের কর্মকান্ডের ফলে এদেশে ইসলাম বিকাশ লাভ করে।

সীমান্ত

মার্কিন অধ্যাপক রিচার্ড ম্যাক্সওয়েল ইটনসহ বহু ঐতিহাসিক, গবেষক মনে করেন, বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থান বিশ্লেষণের মাধ্যমে এদেশে ইসলামের ক্রমবিকাশ হয়েছে। তাঁদের মতে, ভৌগোলিক কারণে পূর্ববাংলা ছিল একটি বিশেষায়িত সীমান্ড় অঞ্চল। এ সীমান্ড় নদীবেষ্টিত উর্বর সমতল ভূমির অঞ্চল ছিল। ফলে স্বভাবতই এদেশে অভিবাসন প্রক্রিয়ায় নতুন বসতি গড়ে ওঠে। আর এ বসতির নেতৃত্ব দেন সুফি-সাধক ও ধর্মীয় ব্যক্তিগণ। তাঁদের কর্মকান্ডে এতদঞ্চলে ইসলাম জনপ্রিয় হয়ে ওঠে এবং পরবর্তীতে বিকশিত হয়।

আঞ্চলিক সুবিধা

প্রাচীন বাংলায় ধর্মসমূহের সাধারণ বৈশিষ্ট্যের আলোকে আলোচ্য তত্ত্বে বাংলায় ইসলামের ক্রমবিকাশ ব্যাখ্যা করা হয়েছে। বহু ঐতিহাসিক গবেষকের মতে, প্রাচীন বাংলার ধর্মসমূহের সাধারণ বৈশিষ্ট্য ছিলো পারস্পরিক উদারতা ও সংমিশ্রণ। এ কারণে যুগে যুগে এ অঞ্চলে নানা ধর্মের আগমন ও প্রসার ঘটেছে। ফলে সর্বশেষ ধর্ম হিসেবে এদেশে ইসলামের আগমন

ঘটলে অতিদ্রুত তা সমাজে ছড়িয়ে পড়ে। আঞ্চলিক উদারতাবাদের প্রভাবে ইসলাম ক্রমান্বয়ে অন্যান্য ধর্মের উপর বিজয় লাভ করে ও গোটা অঞ্চলে একক আধিপত্য বিস্তার করতে সমর্থ হয়।

বস্তুতপক্ষে, বাংলাদেশে ইসলামের ব্যাপক প্রসারের কারণ হিসেবে উপর্যুক্ত সবগুলো বিষয় সমানভাবে ক্রিয়াশীল। ইসলামের আগমনের পর হতে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে ক্রমান্বয়ে এসব কারণে এদেশে ইসলাম জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। ফলশ্রুতিতে মুসলিমগণ এদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জাতি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন। বর্তমান কালের বাংলাদেশের মুসলিমগণ ধর্মান্তরিত ঐসব মুসলিমগণেরই উত্তরপুরুষ। আর এভাবেই যুগে যুগে ইসলাম বাংলাদেশে সম্প্রসারিত হয়েছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়নঃ ১৫.৫

নৈর্ব্যক্তিক উত্তর প্রশ্ন

১. বাংলাদেশের প্রথম আদমশুমারী কত খ্রিস্টাব্দে অনুষ্ঠিত হয়?
২. কাঁরা বাংলাদেশে ইসলাম প্রচারে সর্বপ্রধান ভূমিকা পালন করেন?
৩. প্রাচীন বাংলার ধর্মসমূহের সাধারণ বৈশিষ্ট্য কি ছিল?

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১. বাংলাদেশে ইসলামের ক্রমবিকাশের কারণ সম্পর্কে লিখুন।
২. জোরপূর্বক ধর্মান্ড়রকরণ বিষয়ে বর্ণনা করুন।
৩. রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতা সম্পর্কে সমালোচনা উলে- খ করুন।
৪. অভিবাসন বিষয়ের সারকথা বর্ণনা করুন।
৫. প্রাথমিক পর্যায়ে বাংলাদেশে ইসলাম প্রচারের কতিপয় বাঁধার বিবরণ দিন।

রচনামূলক প্রশ্ন

১. বাংলাদেশে ইসলাম প্রচার ও প্রসার সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করুন।
২. বাংলায় ইসলাম প্রচারে সাংস্কৃতিক মধ্যস্থতাকারী বিষয়টি বিশ্লেষণ করুন।
৩. বাংলাদেশে ইসলাম ধর্মের ক্রমবিকাশে সামাজিক মুক্তি সম্পর্কে ভূমিকা আলোচনা করুন।

পাঠ-৬ : বাংলাদেশে ইসলাম প্রচারকগণ

উদ্দেশ্য

এ পাঠ অধ্যয়ন করে আপনি

- বাংলাদেশের ইসলাম প্রচারকগণ সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন।
- বাংলাদেশে ইসলাম প্রচারে পীর-মাশায়েখ ও আলিমগণের ভূমিকা আলোচনা করতে পারবেন।
- বাংলাদেশে ইসলাম প্রচারের নানা স্তর বিন্যাস সম্পর্কে বিবরণ দিতে পারবেন।

বাংলাদেশে ইসলাম প্রচারকগণ

১২০৪ খ্রিস্টাব্দে বাংলায় ইসলামের রাজকীয় প্রবেশ ঘটলেও সপ্তম শতাব্দী হতে দশম শতাব্দীর কোন এক সময়েই সর্বপ্রথম এ অঞ্চলের অধিবাসীগণ ইসলামের পরিচয় লাভ করেন। পরবর্তীতে অসংখ্য লোকের প্রচেষ্টায় ধীরে ধীরে ইসলাম এ অঞ্চলে সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের ধর্ম হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। ইসলামের এ ব্যাপক সম্প্রসারণে এদেশে ইসলাম প্রচারকগণের ভূমিকা ছিল অসামান্য। ইসলাম ধর্ম মতে, মুসলিম মাত্রই ধর্ম প্রচারক। ইসলাম ধর্ম প্রচারের জন্য কোন মুসলিমকে আলিম বা মুবাল্লিগ হতে হবে এরূপ কোন বাধ্যবাধকতা নেই। বরং ইসলামের আদর্শে বিশ্বাসী সকলেই এ ধর্মের প্রচারক। বাংলাদেশে ইসলামের প্রচারকার্যে ব্যাপৃত প্রচারকগণকে প্রধানত তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। যথা-

ক. বণিক ও অভিবাসীগণ;

খ. শাসক ও বিজেতাগণ;

গ. আলিম পীর ও মুবাল্লিগগণ।

নিম্নে এঁদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় তুলে ধরা হলো-

ক. বণিক শ্রেণী ও অভিবাসীগণ

ঐতিহাসিকগণের মতে, বাংলাদেশে ইসলামের প্রাথমিক পরিচিতি ও প্রচারকার্য পরিচালিত হয় আরব মুসলিম বণিকদের মাধ্যমে। মুসলিম বিজয়পূর্ব বাংলায় আগত বণিকগণই এদেশে ইসলামের পরিচয় তুলে ধরেন। বাণিজ্য উপলক্ষ্যে ভারতবর্ষে এলেও এতদঞ্চলে ইসলাম প্রচরে তাঁদের অবদান ছিল অসামান্য। বিশেষ করে, বন্দর তীরবর্তী এলাকায় তাঁদের মাধ্যমেই সর্বপ্রথম ইসলামের দাওয়াত প্রচারিত হয়।

পরবর্তীতে, ১২০৪ সালে মুসলিমদের বাংলা বিজয়ের ফলে এদেশের সাথে আরবদের বাণিজ্য সম্পর্ক গভীরতর হয়। ফলশ্রুতিতে ব্যাপকহারে আরব বণিকগণ এদেশে আগমন করেন এবং এদেশে ইসলামের প্রচার বেগবান হয়।

বাংলায় মুসলিম বিজয়ের ফলে এদেশে অভিবাসী মুসলিমগণের সংখ্যাও ব্যাপকহারে বাড়তে থাকে। আরব, পারস্য, তুরস্ক, মধ্য এশিয়া, ইত্যাদি অঞ্চল থেকে বিপুলসংখ্যক মুসলমানগণ অভিবাসী হিসেবে এদেশে আগমন করেন এবং বসতি স্থাপন করেন। ঐতিহাসিকগণের মতে, এ অভিবাসীগণ দ্বারাই এদেশে সর্বপ্রথম মুসলিম সমাজ প্রতিষ্ঠা হয়। অভিবাসী এ মুসলিমগণ এ অঞ্চলে মসজিদ, মাদ্রাসা, মক্তব, খানকাহ ইত্যাদি প্রতিষ্ঠা করেন। স্থানীয় অমুসলিম অধিবাসীদের সাথে মেলামেশার সুযোগে তাঁরা ইসলামের অনুপম সৌন্দর্য তাদের কাছে তুলে ধরেন। তাছাড়া স্থানীয় মুসলিমদের সাথে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়ে তাঁরা এ অঞ্চলে মুসলিমদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনে ব্যাপক ভূমিকা পালন করেন।

খ. শাসক ও বিজেতাগণ

বাংলাদেশে ইসলাম প্রচারকগণের দ্বিতীয় দল হলেন এদেশে আগত মুসলিম শাসক, বিজেতা, সৈনিক ও রাজকর্মকর্তা-কর্মচারীগণ। এ অঞ্চলে ইসলাম প্রচারে তারা প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ না করলেও পরোক্ষভাবে তাঁরা ইসলাম প্রচারে ব্যাপক ভূমিকা পালন করেন। ইখতিয়ার উদ্দীন মুহাম্মদ ইবন বখতিয়ার খিলজীর বাংলা বিজয়ের মাধ্যমে এতদঞ্চলে এ শ্রেণীর লোকদের আগমন ঘটতে থাকে। শাসন কার্যের সুবিধার্থে তাঁরা নানা কর্মসূচী গ্রহণ করেন। যা এদেশে ইসলাম প্রচারের ব্যাপক সুযোগ সৃষ্টি করে। প্রাথমিক পর্যায়ে বাংলার স্বাধীন সুলতানগণ ও পরবর্তীতে মোগল শাসকদের দ্বারা এ অঞ্চলে ইসলাম প্রচারের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হয়। সুলতান ও রাজকর্মচারীগণ মুসলিম হওয়ায় নিজেরা বাস্ড়ব জীবনে ইসলাম অনুশীলন করতেন। তাছাড়া সুলতানগণ ইসলামের পৃষ্ঠপোষকতায় ছিলেন অনন্য। মসজিদ, মাদ্রাসাসহ ইসলাম চর্চার নানা সুযোগ-সুবিধা ও প্রতিষ্ঠান তৈরিতে তাঁরা ছিলেন উদারহস্ড়। তৎকালীন সমাজে প্রচলিত হিন্দু ও বৌদ্ধ সংস্কৃতির মুকাবিলায় ইসলামী সংস্কৃতি, আরবী-ফারসী ভাষারীতির প্রচলন, বাংলা ভাষায় ইসলামী পরিভাষার ব্যবহার ইত্যাদির প্রবর্তকও ছিলেন সুলতানগণ। তাঁরা রাজদরবারে মুসলিম শায়খ, পীর-মাশায়েখ, আলিম, মুবালি- গ, বিজ্ঞানীদের সাদরে অভ্যর্থনা জানাতেন এবং প্রয়োজনীয় পৃষ্ঠপোষকতা দান করতেন। বস্তুত সুলতানগণ ছিলেন এদেশে মুসলিম সমাজ প্রতিষ্ঠার মূল কারিগর। তাঁদের শাসনে এদেশে ইসলাম প্রচারের যাবতীয় বাধা-বিঘ্ন দূর হয়ে যায় ও ধর্ম প্রচারের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হয়। ফলে

দূরদূরান্ত হতে বহু মুবালি-গ এদেশে আসেন ও ধর্মপ্রচার করেন। প্রকৃতপক্ষে, বাংলাদেশে ইসলামের প্রচার ও প্রসারে পরোক্ষ শক্তি হিসেবে সুলতানগণ ও প্রশাসনিক কর্মকর্তা কর্মচারীদের অবদান ছিল অপরিসীম।

আলিম, পীর ও মুবাল্লিগগণ

বাংলাদেশে ইসলামের ব্যাপক প্রসার ও বিকাশে এদেশে আগত আলিম, পীর-মাশায়েখ ও মুবালি-গদের ভূমিকা ছিল সর্বপ্রধান। ইসলাম প্রচারের মূল দায়িত্ব এঁদের দ্বারাই পরিচালিত হয়। সাধারণভাবে ইসলাম প্রচারক বলতে এই শ্রেণীর মনীষীদের উলে-খ করা হয়ে থাকে। ইসলামের আগমনের সময় হতে বর্তমান যুগ পর্যন্ত এদেশে ইসলাম প্রচারে এ শ্রেণীর প্রচারকগণ ছিলেন সদা সক্রিয়।

মুসলিম বিজয়ের পর হতে বর্তমান কাল পর্যন্ড় বাংলায় ইসলাম প্রচারের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, এদেশে ইসলাম প্রচারের গতি সবসময় একরূপ থাকেনি। বরং ভিন্ন ভিন্ন সময়ে বহু ধর্ম প্রচারকগণ নানা স্থানে ইসলাম প্রচার করেছেন। তাঁদের কর্মকান্ড ও ধর্মপ্রচার কার্যের উপর ভিত্তি করে ঐতিহাসিকগণ এ সময়কালকে ৩টি ভাগে ভাগ করেন-

প্রথম যুগ - প্রাথমিক কাল;
দ্বিতীয় যুগ - যৌবনকাল বা স্বর্ণযুগ;
তৃতীয় যুগ - আধুনিক কাল।

বাংলায় ইসলাম প্রচারের এ তিনটি যুগেই বহুসংখ্যক মুসলিম ধর্মপ্রচারকগণ এদেশে আগমন করেন। আরব, ইরাক, ইরান, তুরস্ক, মধ্য এশিয়া, ইয়ামান, খোরাসান প্রভৃতি অঞ্চল থেকে আগত ধর্ম প্রচারকগণ ইসলাম ধর্ম প্রচারের সাথে সাথে এদেশে ইসলামী শিক্ষা ও সংস্কৃতির বুনিয়াদও স্থাপন করেন। নিম্নে তিনটি পর্যায়ে আগত উলে-খযোগ্য পীর-মাশায়েখ ও উলামা-মুবালি-গগণের সংক্ষিপ্ত বিবরণ তুলে ধরা হলো-

প্রথম যুগ

বাংলায় ইসলাম প্রচারের প্রথম যুগ ছিল একাদশ, দ্বাদশ শতক ও ত্রয়োদশ শতকের প্রথম পর্ব পর্যন্ত বিস্তৃত। তবে প্রকৃতপক্ষে এ অঞ্চলে ইসলামের আগমনের প্রারম্ভ হতেই এ যুগের সূচনা হয়। এ সময়কাল ছিল এদেশে ইসলাম প্রচারের প্রাথমিক যুগ বা শৈশবকাল। এসময় অমুসলিমদের বিরোধিতা ও আসহযোগিতা যেমন প্রবল ছিল, তেমনি মুসলিম রাজশক্তির ক্ষমতাও ছিল দুর্বল। ফলে এ সময়কার ধর্মপ্রচারকগণ বহু বাধা বিপত্তির মুকাবিলা করে ধর্মপ্রচার করেন। এমনকি কোন কোন স্থানে বিধর্মীদের সাথে ধর্মযুদ্ধে লিপ্ত হওয়ারও প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল। এরূপ যুদ্ধে বহু ধর্ম প্রচারক শাহাদাত বরণ করেন।

ইসলাম প্রচারের এ স্তরে বাংলার সব অঞ্চলে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছানো সম্ভব হয়নি। তবে বড় বড় শহর, বন্দর ও উলে-খযোগ্য স্থানে এসব ধর্মপ্রচারক ইসলাম ধর্ম প্রচার করেন। যেমন, চট্টগ্রাম, পান্ডুয়া, মহাস্থানগড় (বর্তমান বগুড়া), নদীয়া, সোনারগাঁ, বিক্রমপুর, দেওকোট, মঙ্গলকোট (বর্তমান পশ্চিমবঙ্গে অবস্থিত), মদনপুর (নেত্রকোনা), রাজশাহী ইত্যাদি।

এ পর্যায়ের ধর্মপ্রচারকদের মধ্যে অন্যতম হলেন বাবা আদম শহীদ, শাহ মুহাম্মদ সুলতান বলখী, শাহ সুলতান রুমী, শাহ মাখদুম রূপোশ, শায়খ জালালুদ্দীন তাবরিযী, শায়খ ফরীদুদ্দীন (রহ.) প্রমুখ।

দ্বিতীয় যুগ

বাংলায় ইসলাম প্রচারের দ্বিতীয় যুগকে বলা হয় এদেশে ইসলাম প্রচারের স্বর্ণযুগ। এটি ত্রয়োদশ শতকে শুরু হয়ে চতুর্দশ শতক পর্যন্ত প্রায় দেড়শত বছর কাল ব্যাপৃত। এ সময় বাংলায় ধর্মপ্রচারের প্রতিকূল পরিবেশ ও বিরোধিতা অনেকাংশে স্তিমিত হয়ে পড়ে। মুসলিম রাজশক্তি এসময় পূর্ণ শক্তিতে বলীয়ান হয়ে ধর্মপ্রচারে সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদান করে। ফলে এ সময় এদেশের বিপুল পরিমাণে মানুষ ইসলাম গ্রহণ করে। এ কারণে এ সময়কে এদেশের ইসলাম প্রচারের স্বর্ণযুগ বলা হয়। এ স্তরে যে সব ধর্মপ্রচারক ইসলাম প্রচারে বিশেষ ভূমিকা পালন করেন তাঁদের মধ্যে উলে-খযোগ্য হলেন-

হযরত শাহজালাল ইয়ামেনী, শাহ পরাণ, শাহ্ তুর্কান শহীদ, শায়খ শারফুদ্দীন আবু তাওয়ামা, শাহ সুফী শহীদ, শাহ সুলায়মান ফতেহ গাযী, জাফর খাঁ গাযী, শাহ বদরুদ্দীন, শাহ মুস্ড়ফা, মাওলানা তাকী উদ্দীন আরাবী, শায়খ আব্দুল্লাহ কিরমানী, সাইয়্যেদ আব্বাস আলী মাক্কী, শরীফ শাহ, শায়খ শরফুদ্দীন ইয়াহইয়া মানেরী (রহ.) প্রমুখ।

তৃতীয় যুগ

বাংলায় ইসলাম প্রচারের তৃতীয় যুগ পঞ্চদশ শতক হতে শুরু করে বর্তমান সময় পর্যন্ত বিস্তৃত। এ সময় বাংলা অঞ্চল ক্রমান্বয়ে মুসলিম প্রধান অঞ্চল হিসেবে পরিচিত হয়ে ওঠে। এ সময়কালে ইসলাম প্রচারের ক্ষেত্রে বিরোধিতা প্রায় ছিল না

বললেই চলে। তবে বিচ্ছিন্নভাবে নানা স্থানে অমুসলিম শক্তির মুকাবিলা করার ঘটনাও এ যুগে বিরল ছিল না। এ যুগের ধর্মপ্রচারকদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন-

শায়খ আনওয়ার শহীদ, খান জাহান আলী, শাহ নিয়ামত উল্লাহ, শাহ আমানত, শায়খ যায়নুদ্দীন বাগদাদী, শাহ ইসমাঈল গাযী, কারামত আলী জৌনপুরী, শাহ আলী বাগদাদী, বাবা আদম, শাহ চাঁদ আউলিয়া, আবু বকর সিদ্দীকী, শাহ নূর কুতবুল আলম, শাহ পীর, হাজী শরীয়তুল্লাহ, মীর নিসার আলী প্রমুখ।

প্রকৃতপ্রস্তাবে, বাংলায় ইসলাম প্রচারে যুগে যুগে আগত এসব সূফী-সাধক, পীর-আউলিয়া, আলিম-মুবাল্লিগ, শায়খদের অবদান চিরস্মরণীয়। তাঁদের অক্লান্ত পরিশ্রম ও চেষ্টায় এদেশে ধীরে ধীরে ইসলাম বিকশিত হয়। মূলত তাঁদের ধর্মপ্রচার ও শিক্ষাদানই এদেশের মুসলিম সমাজ ও সংস্কৃতির ভিত্তিপ্রস্তর স্বরূপ।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন: ১৫.৬

নৈর্ব্যক্তিক উত্তর প্রশ্ন

১. বাংলাদেশে ইসলাম প্রচারগণকে কতটি ভাগে ভাগ করা যায়?
২. বাংলাদেশে ধর্ম প্রচারের স্বর্ণযুগ কোন যুগকে বলা হয়?
৩. ইসলাম প্রচারের আধুনিক যুগে আগত কতিপয় ধর্মপ্রচারকের নাম লিখুন।
৪. শাহ মাখদুম রূপোশ কোন যুগের ধর্মপ্রচারক ছিলেন?
৫. কোন কোন অঞ্চল থেকে এদেশে ধর্মপ্রচারকগণ আগমন করেছিলেন?

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১. বাংলায় ইসলাম প্রচারে সুলতানগণের অবদান বর্ণনা করুন।
২. বাংলাদেশে ইসলাম প্রচারের দ্বিতীয় যুগের সম্পর্কে বিস্ড়রিতভাবে আলোচনা করুন।
৩. ইসলাম প্রচারের প্রথম যুগে বাংলার কোন কোন অঞ্চলে ইসলাম প্রচার করা হয়েছিল?

রচনামূলক প্রশ্ন

১. বাংলাদেশে ইসলাম ধর্মের প্রচারকগণের পরিচয় ও অবদান বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করুন।

পাঠ-৭ : ইসলামী সংস্কৃতি ও বাংলাদেশ

উদ্দেশ্য

এ পাঠ করে আপনি

- বাংলাদেশে প্রচলিত ইসলামী আচার-অনুষ্ঠান সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন।
- বাংলাদেশে ইসলাম অনুশীলনের অবস্থা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- বাংলাদেশে ইসলামী প্রতিষ্ঠানসমূহ সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন।

ইসলামী সংস্কৃতি ও বাংলাদেশ

বাংলাদেশ একটি উদারপন্থী মুসলিম প্রধান দেশ। এদেশের জনগণ ধর্মপরায়ণ ও মানবতাবাদী আদর্শে বিশ্বাসী। ধর্মের নামে গোঁড়ামি, সন্ত্রাসবাদ কিংবা ধ্বংসাত্মক কার্যক্রম পরিচালনা করা এদেশের মুসলিমদের আদর্শ নয়। এদেশে যেমন ধর্মের নামে কট্টরপন্থার স্থান নেই, তেমনি উদারতার সুযোগে ধর্মের অপব্যবহারের সুযোগও নেই। বরং এদেশের মুসলিমগণ প্রকৃত ইসলামী আদর্শে পরিচালিত খাঁটি ও ধর্মপ্রাণ মুসলিম হিসেবে পরিচিত। ইসলামী ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির অনুশীলনের সাথে সাথে এদেশের মুসলিমগণ মানবতাবাদ ও উদারনৈতিক আদর্শেরও অনুসারী। পরমত সহিষ্ণুতা, অপর ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীলতা ও পারস্পরিক সহযোগিতার মূলনীতির উপর ভিত্তি করে এদেশীয় সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠিত। ইসলামের প্রকৃত শিক্ষাও এরূপই।

বাংলাদেশের মুসলিমগণ ব্যক্তিজীবনে ইসলামী বিধি-বিধান ও সংস্কৃতির পূর্ণ অনুসারী। ব্যক্তি জীবনের একেবারে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বিষয় হতে শুরু করে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহেও ইসলামী সংস্কৃতির অনুশীলন এদেশীয় মুসলিমদের জীবনে বিদ্যমান। জন্ম হতে শুরু করে মৃত্যু পর্যন্ত সর্বক্ষেত্রে ইসলামের আদর্শের বিদ্যমানতা এখানে বিরল নয়। পাশাপাশি সমাজ জীবনের নানা স্ড়রেও এদেশে ইসলামের অনুসরণ লক্ষণীয়। স্থান-কাল-পাত্র নির্বিশেষে এদেশে ইসলামের অনুশীলন ব্যাপকভাবে লক্ষণীয়। বস্তুত, সূফী-সাধকদের প্রেমপূর্ণ জীবনের আহ্বান, বাঙ্গালী সংস্কৃতি, মানবতাবাদ ও ইসলামী সংস্কৃতির সংমিশ্রণ এদেশের অনন্য বৈশিষ্ট্য।

এদেশীয় মুসলিমগণ বাস্তবিকই ধর্মপ্রাণ। দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করা, রমযান মাসে রোযা পালন, হজ্জ, যাকাত আদায় করা ইত্যাদির প্রচলন এদেশে ব্যাপকহারে লক্ষণীয়। এছাড়া সমষ্টিকভাবে ইসলামী উৎসব ও আচার অনুষ্ঠানও এদেশে পালিত হয় সামষ্টিকভাবে ও আড়ম্বরপূর্ণ পরিবেশে।

ইসলাম ধর্মীয় উৎসব অনুষ্ঠানসমূহ

বাঙালী জাতি স্বভাবতই উৎসব প্রিয় জাতি। এদেশীয় মুসলিমগণও এর ব্যতিক্রম নন। ইসলামের নানা আচার অনুষ্ঠান এখানে উদযাপিত হয় সকলের ঐক্যতানে। সরকারি বেসরকারি ও সর্বোপরি সকল জনগণের স্বত:স্ফূর্ত অংশগ্রহণে এসব ধর্মীয় উৎসব ও অনুষ্ঠান পালিত হয়। বাংলাদেশে উদযাপিত ইসলামী ধর্মীয় উৎসব অনুষ্ঠানের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কতিপয় নিম্নরূপ-

ঈদুল ফিতর

মুসলিমদের সর্বপ্রধান ধর্মীয় উৎসব হলো ঈদুল ফিতর। আরবী চান্দ্র মাস শাওয়ালের প্রথম তারিখে সারা বিশ্বের মুসলিমগণ এ আনন্দ উৎসব উদযাপন করে থাকেন। বাংলাদেশে স্বর্বস্ড়রের মুসলিমগণ জাতি বর্ণ নির্বিশেষে পারস্পরিক প্রেম-ভালবাসা ও সহযোগিতায় এ দিবসটি স্বত:স্ফূর্তভাবে পালন করে থাকেন।

ঈদুল আযহা

মুসলিমদের দ্বিতীয় প্রধান ধর্মীয় উৎসব হলো ঈদুল আযহা। বাংলাদেশে এ উৎসবটি কুরবানীর ঈদ নামেও পরিচিত। যিলহজ্জ মাসের ১০, ১১ ও ১২ তারিখে এ ঈদ উৎসব পালিত হয়ে থাকে। আল্লাহর উদ্দেশ্যে পশু কুরবাণীর দ্বারা আত্মত্যাগের এ উৎসবটিও এদেশের মুসলিমগণ উদযাপন করে থাকেন আড়ম্বরপূর্ণ ভাবে।

ঈদে মীলাদুন্নবী (স.)

হযরত মুহাম্মদ (স.) এর জন্মদিনকে কেন্দ্র করে এ উৎসব পালিত হয়ে থাকে। হিজরী সালের ১২ই রবিউল আউয়াল তারিখে এ উৎসব অত্যন্ত জাঁকজমকপূর্ণভাবে সর্ব সাধারণ মুসলমানের অংশগ্রহণের মাধ্যমে পালিত হয়। এ দিনে রাসূল (স.) এর জীবনী আলোচনা, মীলাদ মাহফিল, জশনে জুলুছ, আনন্দ মিছিল, তাবারুক বিতরণ ইত্যাদির মাধ্যমে মুসলিমগণ আনন্দ প্রকাশ করে থাকেন।

'আশূরা

মহাররম মাসের ১০ তারিখ এ অনুষ্ঠান পালিত হয়ে থাকে। ইসলামের ইতিহাসে এ দিনটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। বিশেষ করে, এ দিনেই কারবালায় ইমাম হোসাইনের মর্মান্তিক শাহাদাতের ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল। ৯ এবং ১০ মহাররম দুই দিন ব্যাপী রোযা পালন ও অন্যান্য নফল ইবাদতের মধ্যে এ দিনটি এদেশের মুসলিমগণ পালন করে থাকেন। 'আশূরা মুসলিমদেরকে ইমাম হুসাইন (রা.) -এর আদর্শের আলোকে অন্যায় অবিচার ও অসত্যের কাছে মাথা নত না করার শিক্ষা প্রদান করে। এদেশীয় শী'আ সম্প্রদায় দিনটি বিশেষ মর্যাদায় পালন করে থাকে।

শবে ক্বদর

শবে ক্বদর মুসলিমদের পালিত অনুষ্ঠান সমূহের অন্যতম। রমযান মাসের ২৭ তারিখ রাতে মুসলিমগণ এ অনুষ্ঠানটি পালন করে থাকেন। ইসলাম মতে, শবে ক্বদরের এক রাতের ইবাদত হাজার মাসের বিরামহীন ইবাদাতের চেয়েও উত্তম। এজন্য এ রাতটি মুসলিমদের বিশেষ ইবাদাতের রাত। মুসলিমগণ নফল নামায, যিকির, ওয়াজ-নসীহত, কুরআন তিলাওয়াত, দু'আ মুনাজাত ইত্যাদি ইবাদতের মাধ্যমে গাম্ভীর্যপূর্ণ পরিবেশে রাতটি উদযাপন করে থাকেন।

শবে বরাত

শবে বরাত বা সৌভাগ্যরজনী। শা'বান মাসের ১৫ তারিখ (১৪ শা'বান দিনগত) রাতে এ অনুষ্ঠানটি পালন করা হয়। এ রাতেও সাধারণ মুসলিমগণ নফল নামায, যিকির, কুরআন তিলাওয়াত ও অন্যন্য ইবাদাতের মাধ্যমে আল্লাহর ক্ষমা ও দয়া প্রার্থনা করে থাকেন এবং দিনের বেলা নফল রোযা পালন করেন।

শবে মি'রাজ

রাসূল (স.) এর পবিত্র মি'রাজ এর স্মৃতিস্বরূপ এ রাতটি উদযাপন করা হয়। রজব মাসের ২৭ তারিখে (২৬ রজব দিনগত রাতে) মুসলিমগণ এ অনুষ্ঠানটি পালন করেন। মহান আল-াহর সাথে মহানবী (স.) এর সরাসরি সাক্ষাতলাভের মর্যাদাপূর্ণ ঘটনাকে স্মরণ করে মুসলিমগণ নফল ইবাদাত, রাসূলের জীবনী, আদর্শ ও শিক্ষা সম্পর্কে আলোচনার মধ্য দিয়ে এ পবিত্র রাতটি অতিবাহিত করেন।

বস্তুত বাংলাদেশে মুসলিমদের পালিত অনুষ্ঠান উৎসবগুলির মাধ্যে উপর্যুক্তগুলিই প্রধান। এছাড়াও ছোট বড় আরো বেশ কিছু অনুষ্ঠান বাঙালী মুসলিমগণ সম্মিলিতভাবে উদযাপন করে থাকেন।

বাংলাদেশে ইসলামী প্রতিষ্ঠানসমূহ

বাংলাদেশে বহুসংখ্যক ইসলামী প্রতিষ্ঠান বিদ্যমান। এসব প্রতিষ্ঠানসমূহ একদিকে ইসলামী আদর্শ ও শিক্ষা প্রচার করে থাকে। অন্যদিকে সামাজিক নানা কর্তব্যও সম্পাদন করে থাকে। বাংলাদেশে ইসলামের বিকাশ ও চর্চার ক্ষেত্রে এসব প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা অবিস্মরণীয়। নিম্নে এরূপ কতিপয় ইসলামী প্রতিষ্ঠানের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেয়া হলো-

মসজিদ

বাংলাদেশে বিদ্যমান ইসলামী প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে প্রধানতম হলো মসজিদ। বস্তুত মসজিদই হলো ইসলাম ও মুসলিমদের প্রধান কেন্দ্রস্বরূপ। মহানবী (স.) এর সময় মসজিদে নববীতে বসেই যাবতীয় কাজ সম্পন্ন করা হতো। পরবর্তীতে এ মসজিদকে কেন্দ্র করেই গড়ে ওঠে বিশাল ইসলামী সাম্রাজ্য। বাংলাদেশেও ইসলাম চর্চা ও বিকাশের প্রধান কেন্দ্র মসজিদ। এদেশের গ্রামে-গঞ্জে, শহরে-বন্দরে, প্রত্যন্ড় অঞ্চলে রয়েছে অসংখ্য মসজিদ। এদেশের এমন কোন লোকালয় পাওয়া যায় না যেখানে মসজিদ নেই। বস্তুত মসজিদকে কেন্দ্র করেই এদেশের মুসলিম সমাজে ইসলামী সংস্কৃতি চর্চা হয়ে থাকে। মুসলিমগণ পাঁচ ওয়াক্ত নামাযে মসজিদে গিয়ে পরস্পরিক দেখা-সাক্ষাৎ ও কুশল বিনিময় করতে পারেন। বিশেষত, শুক্রবার জুমু'আর নামাযে এলাকার সকল মুসলিম একত্রিত হয়ে একটি সামাজিক সম্মিলনের জন্ম দেন। পাড়া-মহল্লায় ইসলামী শিক্ষার প্রচার ও প্রসারে মসজিদের ইমাম, মুয়াযযিন ও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণ বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকেন। সামাজিক অনাচার ও মুল্যবোধের অবক্ষয় মোকাবিলায়ও মসজিদ ইসলামী কেন্দ্রের ভূমিকা স্বরূপ কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারে।

মাদ্রাসা

মাদ্রাসা হলো ইসলামী শিক্ষায়তন যেখানে ইসলামী শিক্ষা প্রদান করা হয়। ইসলামী ঈমান-আকীদা, কুরআন-হাদীস-ফিকহ চর্চা, ইসলামের ইতিহাস, ইসলামী আদর্শ ও সংস্কৃতি, বাস্তব জীবনে ইসলামী অনুশাসন ও বিধি বিধানসমূহের শিক্ষা মাদ্রাসা হতেই পাওয়া যায়। মাদ্রাসা ইসলামী চিন্তাবিদ, গবেষক ও আলিম তৈরির কারখানা হিসেবে পরিচিত। বাংলাদেশে ইসলামী এ প্রতিষ্ঠানও বিপুল সংখ্যায় বিদ্যমান। এদেশে ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা প্রচারে মাদ্রাসার ভূমিকা অতুলনীয়। ন্যায়-অন্যায়, ভাল-মন্দ, ইত্যাদির পার্থক্য পরিস্ফুটনেও মাদ্রাসাগুলো এদেশের জনগণের পথের দিশারী স্বরূপ।

মক্তব

ইসলামী শিক্ষালয়গুলোর অন্যতম হলো মক্তব। সাধারণত এসব মক্তব মসজিদ কেন্দ্রিক প্রতিষ্ঠান। এসব প্রতিষ্ঠানে পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত শিক্ষা দেয়া হয়। পাশাপাশি ইসলামের প্রাথমিক বিশ্বাস ও বিধি-বিধানও শিক্ষা দেয়া হয়। বাংলাদেশের প্রায় প্রতিটি মসজিদেই মক্তব চালু রয়েছে। ছেলেমেয়েরা সেখান হতে বাল্যকালেই ইসলাম প্রসঙ্গে প্রাথমিক ধারণা লাভ করে থাকে। অনেক স্থানে মক্তবে বয়স্কদের জন্যও কুরআন শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে। সাধারণত মক্তবসমূহে বিনাবেতনে শিক্ষা প্রদান করা হয়ে থাকে।

খানকাহ

বাংলাদেশে বিদ্যমান ইসলামী প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে খানকাহ অন্যতম। পীর মাশায়েখের অধীনে পরিচালিত এসব খানকাহ ইসলাম প্রচার ও প্রসার কেন্দ্র হিসেবে কাজ করে। খানকাহসমূহকে কেন্দ্র করে মসজিদ মাদ্রাসা ইত্যাদিও প্রতিষ্ঠিত হয়। ফলে ইসলাম চর্চাকেন্দ্র হিসেবে এগুলো ব্যাপক ভূমিকা পালন করতে পারে। সাধারণত খানকাহ হলো একটি মিলনস্থান। এখানে পীর-মাশায়েখ তাঁর অনুসারীদের সাথে মিলিত হন; অনুসারীদেরকে ইসলামী জীবনের নানা দিক নির্দেশনা প্রদান করেন; যিকর আযকার শিক্ষা দেন; আত্মশুদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় শিক্ষা অনুশীলন করান। বস্তুত খানকাহকে কেন্দ্র করেই পীর ও শায়খগণ নিজ নিজ কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকেন। প্রাথমিক যুগে বাংলাদেশে ইসলাম প্রচার ও প্রসারে খানকাহগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। বর্তমানকালেও খানকাহসমূহ ইসলামী শিক্ষা বিকাশে অবদান রেখে চলছে।

মাযার

মাযার বাংলাদেশের অন্যতম ইসলামী প্রতিষ্ঠান। সাধারণত পীর-মাশায়েখ, ওলী-আউলিয়ার মৃত্যুর পর তাঁর কবরকে কেন্দ্র করে এ প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। পরবর্তীতে একে কেন্দ্র করে নানা ইসলামী প্রতিষ্ঠানও পরিচালিত হয়। ফলে মাযারকে ঘিরে ইসলামী কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা বাংলাদেশে ব্যাপকভাবে লক্ষ্যণীয়। মাযার ইসলামী আদর্শ ও সৌন্দর্য প্রকাশক একটি অন্যতম প্রতিষ্ঠান। লোকজন ওলী-আউলিয়ার মাযার দেখে ও তাঁদের জীবনী অধ্যয়ন করে ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হতে পারে। তবে ইদানীং মাযার কেন্দ্রিক নানা অনৈসলামিক কার্যকলাপ সংঘঠিত হচ্ছে যা কোনক্রমেই ইসলাম সম্মত নয়।

অন্যান্য প্রতিষ্ঠান

বাংলাদেশে ইসলাম প্রচার ও প্রসার কল্পে উপর্যুক্ত সাধারণ প্রতিষ্ঠানসমূহের পাশাপাশি আরো বেশ কিছু প্রতিষ্ঠান রয়েছে। সরকারি ও বেসরকারী তত্ত্বাবধানে পরিচালিত এসব প্রতিষ্ঠান এদেশে ইসলামী আদর্শ বাস্ড়বায়নে গুর"ত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলছে। এদের মধ্যে উলে- খযোগ্য হলো- ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, ইসলামী ব্যাংক ও বীমা প্রতিষ্ঠান, ইসলামী গবেষণা প্রতিষ্ঠান, ইসলামী প্রকাশনা ও মুদ্রণ সংস্থা, ইসলামী মিডিয়া, সেবা সংস্থা প্রভৃতি।

পাঠোত্তর মূল্যায়নঃ ১৫.৭

নৈর্ব্যক্তিক উত্তর প্রশ্ন

১. বাংলাদেশের প্রধানতম ইসলামী উৎসবের নাম লিখুন।
২. শবে বরাত কি?
৩. 'আশূরার শিক্ষা লিপিবদ্ধ করুন?

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১. ইসলাম প্রচারে মসজিদের ভূমিকা আলোচনা করুন।
২. বাংলাদেশে ঈদে মীলাদুন্নবী (স.) কীভাবে উদযাপিত হয়- বর্ণনা করুন।
৩. বাংলাদেশের মুসলিমদের ধর্মীয় অবস্থা বর্ণনা করুন।
৪. প্রধান দু'টি ঈদ উৎসবের বিবরণ দিন।
৫. ইসলাম প্রচারে খানকাহ সমূহের অবদান ব্যাখ্যা করুন।

রচনামূলক প্রশ্ন

১. বাংলাদেশে উদযাপিত ইসলামী উৎসব ও অনুষ্ঠানসমূহের বিবরণ লিপিবদ্ধ করুন।
২. বাংলাদেশে বিদ্যমান ইসলামী প্রতিষ্ঠানসমূহের পরিচয় সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

পাঠ-৮ : বাংলাদেশের বিভিন্ন মুসলিম সম্প্রদায়

উদ্দেশ্য

এ পাঠ করে আপনি

- বাংলাদেশের বিভিন্ন মুসলিম সম্প্রদায় সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন।
- বিভিন্ন মাযহাব সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন।
- বাংলাদেশে বিদ্যমান নানা সুফী তরীকার বিবরণ দিতে পারবেন।
- আহলে হাদীস সম্প্রদায়ের মতাদর্শ ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

বাংলাদেশের মুসলিম জনসংখ্যা

বাংলাদেশ জনসংখ্যার দিক হতে তৃতীয় বৃহত্তম মুসলিম দেশ। এদেশের জনসংখ্যার প্রায় ৯০ শতাংশই মুসলিম। ২০০৭ সালের জুলাই মাসের হিসাব অনুযায়ী বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যা ১৪ কোটি ২৬ লক্ষ প্রায়। তন্মধ্যে মুসলিম জনসংখ্যা প্রায় ১৩ কোটি। এ পর্যন্ত বাংলাদেশে পরিচালিত আদমশুমারী অনুযায়ী এদেশের মুসলিম জনসংখ্যার শতকরা হার নিম্নে দেখানো হলো-

আদমশুমারী	মোট জনসংখ্যা (মিলিয়ন)	মুসলিম জনসংখ্যা (শতকরা হার)
১৯৮১	৮৭.১১	৮৫.৬৫
১৯৯১	১০৬.৩১	৮৮.৩১
২০০১	১২৪.৩৫	৮৯.৫৮

বাংলাদেশের মুসলিম সম্প্রদায়সমূহ

বাংলাদেশের এ বিশাল মুসলিম জনগোষ্ঠী নানা সম্প্রদায়ে বিভক্ত। ইসলামী আকীদা বা বিশ্বাসের ভিন্নতা এবং ইসলামী বিধি-বিধান তথা শরী'আতের উৎসসমূহের নানামুখী ব্যাখ্যার কারণে মুসলিমদের মধ্যে নানা সম্প্রদায়ের উদ্ভব ঘটেছে। মুসলিম জনগোষ্ঠীর এসব সম্প্রদায়গত পার্থক্য বাংলাদেশের সমাজেও লক্ষ্যণীয়। এসব ফিরকা বা মতাদর্শের মধ্যে উলে- খযোগ্য কতিপয় সম্প্রদায়ের সংক্ষিপ্ত পরিচয় আলোচ্য পাঠে তুলে ধরা হলো-

১. সুন্নী সম্প্রদায়

বাংলাদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিমগণ সুন্নী সম্প্রদায়ের মতাদর্শে বিশ্বাসী। সুন্নী সম্প্রদায়কে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতও বলা হয়ে থাকে। সুন্নী শব্দের উৎপত্তি সুন্নাত শব্দ হতে। অর্থাৎ যে সম্প্রদায়ের লোকজন রাসূলুল-াহ (স.) এর সুন্নাত তথা নির্দেশনা ও কর্মপদ্ধতি এবং সাহাবীগণের আদর্শের অনুসারী তাদেরকে সুন্নী বলা হয়। অন্য কথায় বলা চলে, যে সমস্ড় মুসলিম জীবন পরিচালনায় মহানবী (স.) ও সাহাবায়ে কেরামের নির্দেশিত জীবন পদ্ধতি ও আচার আচরণের অনুসরণ করেন তাঁরাই সুন্নী সম্প্রদায়। প্রকৃতপক্ষে, ইসলামের বিভিন্ন সম্প্রদায়সমূহের মধ্যে একমাত্র আহলে সুন্নাত ওয়া জামা'আতই সর্বাংশে সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। তাঁরা রাসূল (স.) এবং সাহাবায়ে কেরামের আদর্শে নিজ নিজ ধর্মীয় বিধি-বিধান অনুশীলন করে থাকেন। বাংলাদেশের মুসলিম সম্প্রদায়ের বৃহৎ অংশ তথা শতকরা প্রায় ৯৮ ভাগ লোক এ সম্প্রদায়ের অনুসারী।

ইসলামী আইন বা শরী'আতের বিধি-বিধান নির্ধারণের প্রেক্ষিতে সুন্নী সম্প্রদায় প্রধানত দু'ভাগে বিভক্ত। যথা- মাযহাব পন্থী সম্প্রদায় ও আহলে হাদীস সম্প্রদায়। এদের মধ্যে মাযহাবপন্থীগণ চারটি স্বীকৃত মাযহাবের অনুসরণ করে থাকেন।

মাযহাব পন্থী সম্প্রদায়

বাংলাদেশের সুন্নী সম্প্রদায়ের বিশাল অংশ মাযহাব ও তদীয় ইমামকে অনুসরণ করে থাকেন। মাযহাব অর্থ- ধর্মীয় পথ, সঙ্ঘ বা দল। এক এক মাযহাবের অনুসারীগণ নিজ নিজ মূলনীতির আলোকে কুরআন-হাদীস থেকে জীবন সমস্যার ইসলামী সামাধান বের করে থাকেন। ইসলামে স্বীকৃত চারটি মাযহাব রয়েছে। যথা- হানাফী মাযহাব, শাফেয়ী মাযহাব, মালেকী মাযহাব ও হাম্বলী মাযহাব। এ মাযহাব চতুষ্টয়ের মধ্যে বাংলাদেশের মুসলিমগণ হানাফী মাযহাবের অনুসারী হিসেবেই পরিচিত।

হানাফী মাযহাব হলো ইসলামের সর্বপ্রথম মাযহাব। এর প্রতিষ্ঠাতা ইমাম আযম আবূ হানীফা (র.)। তিনি তাঁর সমসাময়িক নানা বিষয়ে বিজ্ঞ ৪০ জন আলিমের বিশেষ পরিষদের মাধ্যমে এ মাযহাবের প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দান করেন। তাঁর এ মাযহাবের বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো- মানবকল্যাণ। তিনি কুরআন ও হাদীসের পাশাপাশি ব্যক্তিগত বিচার বুদ্ধি ও ইজতিহাদের মাধ্যমে নানা বিষয়ে ফয়সালা প্রদান করেন। এ মাযহাবের বিধি-বিধানগুলো অধিকতর যৌক্তিক এবং বাস্ড়ব সম্মত বিধায় সারা বিশ্বে এর অনুসারীর সংখ্যা সর্বাধিক। বাংলাদেশের প্রায় সব মুসলিমই হানাফী মাযহাব বা হানাফী ফিকহ এর অনুসারী। বাংলাদেশে এ মাযহাবের অনুসারীর সংখ্যা বেশি হওয়ার কারণ হলো- প্রথমত, এদেশে হানাফী মাযহাবের বই পুস্তক ও ফিকহী আলোচনা বেশি প্রচলিত। দ্বিতীয়ত, এদেশে আগত ধর্মপ্রচারক মুবাল্লিগ, উলামা-মাশায়েখ ছিলেন প্রধানত হানাফীপন্থী। ফলে পরবর্তীতে তাঁদের প্রদত্ত শিক্ষার কারণে এদেশে হানাফী ফিকহের বিস্তার ঘটে।

স্বীকৃত অন্য তিনটি মাযহাবের মধ্যে এদেশে চট্টগ্রামে শাফেয়ী মাযহাবের কিছু অনুসারী দেখতে পাওয়া যায়। তাঁরা ইসলামী শরী'আতের ক্ষেত্রে ইমাম শাফেয়ী (র.) প্রণীত নীতিমালা অনুসরণ করে থাকেন। এতদ্ব্যতীত এদেশে মালেকী ও হাম্বলী মাযহাব অনুসারীর সংখ্যা একবারে নেই বললেই চলে।

আহলে হাদীস সম্প্রদায়

সুন্নী সম্প্রদায়ের অপর একটি শাখা হলো আহলে হাদীস সম্প্রদায়। ইসলামী আইন বা শরী'আতের অনুসরণে তারা মাযহাবপন্থীদের বিপরীত। তাঁরা নির্দিষ্ট কোন ইমামের অনুসরণ করেন না। বরং তাঁরা সরাসরি কুরআন ও হাদীসের অনুসারী বলে নিজেদের দাবী করেন। বাংলাদেশে এ সম্প্রদায়ের অনুসারী সংখ্যা খুব বেশি নেই। মাওলানা আব্দুল হাদী ছিলেন এদেশে এ ফিরকার প্রবক্তা। পরবর্তীতে মাওলানা আব্দুল-াহেল বাকী ও আব্দুল-াহেল কাফী প্রমুখের নেতৃত্বে এদেশে আহলে হাদীস আন্দোলন অব্যাহত থাকে। এদেশের উত্তরবঙ্গে এ সম্প্রদায়ের অনুসারীদের তুলনামূলক বেশি দেখতে পাওয়া যায়।

সুন্নী সম্প্রদায়ের উপর্যুক্ত দুইটি শাখা ব্যতীতও বাংলাদেশে আরো কিছু শাখা পরিলক্ষিত হয়ে থাকে। বিশেষত, আকীদাগত কারণে এবং ক্ষেত্র বিশেষে নানা আচার-অনুষ্ঠান পালনের ভিন্নতায় এসব শাখা দৃষ্টিগোচর হয়ে থাকে। এদের মধ্যে উলে-খযোগ্য কতিপয় হলো- (ক) ফরায়িযী সম্প্রদায়, (খ) ওহাবী সম্প্রদায়, (গ) তরীকত পন্থী সূফী সম্প্রদায়, (ঘ) দেওবন্দী উলামা সম্প্রদায় ইত্যাদি।

২. শী'আ সম্প্রদায়

শী'আ সম্প্রদায় মুসলিমদের মধ্যে অন্যতম প্রধান ধর্মীয়-রাজনৈতিক দল। এটি প্রথমে রাজনৈতিক দল হিসেবে আত্মপ্রকাশ করলেও পরবর্তীতে এটি ধর্মীয় দল হিসেবে পরিচিত হয়ে ওঠে। এ সম্প্রদায়ের বিশ্বাস মতে, মহানবী (স.) এর পরবর্তী খলীফা হওয়ার ক্ষেত্রে আলী (রা.) ছিলেন সবচেয়ে যোগ্য প্রার্থী। এ সম্প্রদায় আহলে বায়ত বা নবী পরিবারকে খুবই উচ্চ মর্যাদার চোখে দেখে। তাদের বিশ্বাস মতে- মানুষের সত্য পথের নির্দেশনা দেওয়ার জন্য আহলে বায়তের বংশধরদের মধ্য হতেই ইমাম আবির্ভূত হবেন। এ ক্ষেত্রে ধর্মীয় বিষয়ে তারা খেলাফতের উপরে ইমামতের স্থান দেয়। শী'আ সম্প্রদায় বেশ কিছু দল-উপদলে বিভক্ত। তন্মধ্যে প্রধান ৩টি দল হল সাবিয়া বা ইসমাঈলিয়া সম্প্রদায়, ইছনা আশারিয়া সম্প্রদায় ও যায়দিয়া সম্প্রদায়। বর্তমানে ইরানে শী'আদের ব্যাপক তৎপরতা লক্ষ্য করা যায়। এছাড়া ইরাক, তুরস্ক, সিরিয়া, ইয়ামান প্রভৃতি দেশেও শী'আদের অস্ড়িত্ব বিদ্যমান।

বাংলাদেশেও কিছু সংখ্যক শী'আ অনুসারীদের অবস্থান লক্ষণীয়। এরা মূলত শী'আ শাখা ইছনা আশারিয়া সম্প্রদায়ের অন্ড়র্ভুক্ত। পারস্য ও মধ্য এশিয়া হতে আগত শী'আ মতাবলম্বী ধর্মপ্রচারকদের প্রভাবই এদেশে শী'আ সম্প্রদায়ের অনুসারীদের অস্ড়িত্ব লাভের কারণ বলে মনে করা হয়। তাছাড়া এদেশীয় মুসলিম শাসক, সুলতান ও নওয়াবদের মধ্যেও বেশ কিছু শী'আ মতাবলম্বী ছিলেন বলে জানা যায়। এঁদের মধ্যে উলে-খযোগ্য হলেন- সুলতান আলাউদ্দীন হুসেন শাহ, নুসরত শাহ, নওয়াব সৈয়দ হুসাইন উদ্দীন, নওয়াব শামসুদ্দৌলা, সৈয়দ আহমদ আলী খান, নওয়াব জাসরাত খান প্রমুখ।

বাংলাদেশের ঢাকা জেলায় সর্বাধিক সংখ্যক শী'আ অনুসারীদের দেখা যায়। তাঁদের সংখ্যা প্রায় ১৫ হাজার। তাছাড়া সিলেট, শেরপুর, খুলনা, খাগড়াছড়ি, রাজশাহীতেও শী'আ মতাবলম্বী রয়েছে। পুরাতন ঢাকার হুসেনী দালান বাংলাদেশের শী'আ সম্প্রদায়ের অন্যতম নিদর্শন। তাছাড়া কারবালায় ইমাম হুসাইনের শাহাদাতের ঘটনার স্মৃতিস্বরূপ বাংলাদেশে বহু ইমামবাড়া নির্মাণ করা হয়। এসব ইমামবাড়া বাংলাদেশে শী'আ অনুসারীদের বিশেষ পবিত্র স্থান হিসেবে পরিচিত।

পাঠোত্তম মূল্যায়নঃ ১৫.৮

নৈর্ব্যক্তিক উত্তর প্রশ্ন

এক কথায় উত্তর দিন-

১. বাংলাদেশের জনসংখ্যার প্রায় কতভাগ মুসলিম?
২. সুন্নী সম্প্রদায়ের অপর নাম কি উল্লেখ করুন।
৩. মাযহাব এর পরিচয় দিন।
৪. হানাফী মাযহাবের প্রবর্তক কে ছিলেন?
৫. বাংলাদেশে আহলে হাদীস সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা কে ছিলেন?
৬. শী'আ সম্প্রদায় প্রধানত কত ভাগে বিভক্ত?

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১. সুন্নী সম্প্রদায়ের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিন।
২. মাযহাব কি? প্রসিদ্ধ মাযহাবগুলোর নাম লিখুন।
৩. বাংলাদেশে সুন্নী সম্প্রদায়ের কতগুলি শাখার নাম লিপিবদ্ধ করেন।
৪. শী'আ সম্প্রদায় সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিন।

রচনামূলক প্রশ্ন

১. বাংলাদেশে সুন্নী সম্প্রদায় সম্পর্কে বিস্ড়ারিতভাবে আলোচনা করুন।
২. বাংলাদেশের বিভিন্ন মুসলিম সম্প্রদায়ের সংক্ষিপ্ত পরিচয় লিপিবদ্ধ করুন।

পাঠ-৯ : বাংলাদেশে ইসলাম চর্চা

উদ্দেশ্য

এ পাঠ করে আপনি-

- বাংলাদেশে ইসলাম চর্চা সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন।
- বাংলাদেশে শিক্ষাব্যবস্থায় ইসলাম চর্চা সম্পর্কে বলতে পারবেন।
- বাংলাদেশের সমাজ জীবনে ইসলামী অনুশাসনের অনুশীলন প্রসঙ্গে বিবরণ দিতে পারবেন।
- বাংলাদেশে ইসলাম প্রচারের বর্তমান অবস্থা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- আর্থ-রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের মুসলিমদের অবস্থা বর্ণনা করতে পারবেন।

বাংলাদেশে ইসলাম চর্চা

বাংলাদেশ মুসলিম প্রধান দেশ। এদেশের সার্বিক কর্মকান্ড মুসলিমদের দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে পরিচালিত। ইসলাম ধর্ম এদেশের সমাজ জীবনে অন্যতম প্রভাবক উপাদান হিসেবে কাজ করছে। ব্যক্তিজীবনে হতে শুরু করে একেবারে রাষ্ট্রীয় কার্যাবলীর গুরুত্বপূর্ণ বিষয়েও এদেশে ধর্মের প্রভাব অস্বীকার করা যায় না। আলোচ্য পাঠে বাংলাদেশের মানুষের নানা পর্যায়ে ইসলাম চর্চা প্রসঙ্গে সংক্ষিপ্ত আলোচনা তুলে ধরা হয়েছে।

সামাজিক জীবনে ইসলাম চর্চা

মানুষ সামাজিক জীব। সমাজে তাই মানুষকে সকলের সাথে মিলে মিশে বসবাস করতে হয়। এ সমাজ জীবনে শান্তি ও সমৃদ্ধির জন্য চাই সহযোগিতা ও সহাবস্থান। ইসলাম মানুষকে সামাজিক বিধি বিধান শিক্ষা দিয়েছে। ইসলামের মতে, প্রত্যেক মুসলিম পরস্পর ভাই ভাই। সুতরাং সমাজে এক মুসলিম অপর মুসলিমকে নিজ ভাইয়ের মত মনে করবে। তাঁর সাথে ভাল আচরণ করবে। তাঁকে কোনরূপ কষ্ট দেবে না। হাদীসে এসেছে- 'প্রকৃত মুসলিম সেই ব্যক্তি যা হাত ও মুখ (কথা ও কাজ) হতে অন্য মুসলিম নিরাপদ থাকে' (সহীহ বুখারী)। অন্যদিকে ইসলাম অমুসলিমদের সাথেও সৌজন্যমূক ব্যবহার করার নির্দেশ দিয়েছে। পারস্পরিক বিশ্বাস, সহাযোগিতা, কল্যাণ কামনা, সম্প্রীতি ও সহাবস্থান ইসলাম ধর্মেরই মৌলিক শিক্ষা।

বাংলাদেশের সমাজ ব্যবস্থায় আমরা ইসলামী আদর্শের প্রতিফলন দেখতে পাই। এদেশের সমাজ নানা জাতি বর্ণ ও ধর্মের মানুষের সমন্বয়ে গঠিত। কিন্তু এতদসত্বেও সুপ্রাচীন কাল হতেই এদেশে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিদ্যমান। সমাজের প্রতিটি মানুষ এখানে পরস্পরের সহযোগী। একের আনন্দ যেমন সকলে মিলে উপভোগ করে, তেমনি একের দুঃখ বেদনাও সকলে ভাগ করে নেয়। বাংলাদেশের ইতিহাসে সামাজিক সহাবস্থানের এরূপ বহু নজীর বিদ্যমান। অন্যদিকে, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার উদাহরণ এদেশের ইতিহাসে বিরল। ইসলামের অনুপম আদর্শও তাই।

অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ইসলাম চর্চা

বাংলাদেশের অর্থনীতি সুদমুক্ত অর্থনীতি নয়। সুতরাং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বাংলাদেশ সম্পূর্ণরূপে ইসলামী আদর্শের অনুসারী তা বলা যায় না। তবে আধুনিক অর্থব্যবস্থার পাশাপাশি এদেশে ইসলামী অর্থব্যবস্থা প্রচলনের উদ্যোগও লক্ষণীয়। বিশেষ করে, ব্যাংক ও বীমা ক্ষেত্রে ইসলামী আদর্শের অনুশীলনের চেষ্টা চলছে। আলিমগণের দ্বারা গঠিত শরী'আ বোর্ড গঠনের মাধ্যমে ইসলামী ব্যাংকিং ও বীমা প্রতিষ্ঠান বর্তমান বাংলাদেশের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে না হলেও ব্যাক্তি পর্যায়ে এদেশের ইসলামী অর্থনৈতিক নীতিমালার বাস্তবায়ণ দেখা যায়। যাকাত, উশর, দান-খয়রাত, ফিতরা ইত্যাদির ক্ষেত্রে ইসলামী আইনের অনুশীলন এদেশে লক্ষ্যনীয়। তাছাড়া মজুদদারী, কালোবাজারী, ওজনে কম দেয়া, প্রতারণা করা ইত্যাদি আর্থিক বিষয়াদিতেও মুসলিমগণ ইসলামী বিধান অনুসরণ করে থাকেন।

রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ইসলাম চর্চা

বাংলাদেশের রাজনীতিতে ধর্মের প্রভাব অনেকটাই সুস্পষ্ট। অসংখ্য ইসলামী দলের অস্তিত্ব এর প্রকৃষ্ট প্রমাণ। অন্যন্য রাজনৈতিক দলগুলোও ধর্ম বিশেষ করে ইসলামকে অত্যন্ত সম্মান ও শ্রদ্ধার চোখে দেখে। ইসলাম ধর্মবিরোধী কোন বিধি বিধান এদেশে প্রণীত হয়নি। তবে রাজনীতিতে ধর্মের অপব্যবহারে এদেশে ইসলামের ভাবমূর্তিকে ক্ষুন্ন করছে বলে মনে করা হয়।

শিক্ষা ক্ষেত্রে ইসলাম চর্চা

বাংলাদেশে শিক্ষা ব্যবস্থায় ইসলামী শিক্ষা অর্জনের পূর্ণাঙ্গ সুযোগ রয়েছে। এদেশে প্রাতিষ্ঠানিকভাবেই একাধিক মাধ্যমের শিক্ষা প্রচলিত। যেমন- সাধারণ মাধ্যম, মাদ্রাসা মাধ্যম, ইংরেজী মাধ্যম, কারিগরি শিক্ষা ইত্যাদি। ইসলাম সম্পর্কে শিক্ষাদানের লক্ষ্যে এদেশের সাধারণ শিক্ষা মাধ্যমে প্রায় প্রতিটি শ্রেণীতেই ধর্মীয় শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এমনকি স্নাতক স্নাতকোত্তর ও উচ্চ শিক্ষা পর্যায়ে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ইসলামী শিক্ষা অর্জনের অবাধ সুযোগ রয়েছে। অন্যান্য সাধারণ বিষয়গুলোর ন্যায় ইসলাম বিষয়েও এসব প্রতিষ্ঠানে ব্যাপকতর শিক্ষা প্রদান করা হয়।

ইসলামী শিক্ষা প্রচারের ক্ষেত্রে বাংলাদেশে মাদ্রাসা মাধ্যমে শিক্ষার ভূমিকা অতুলনীয়। এদেশে প্রধানত দু'প্রকারের মাদ্রাসা শিক্ষা দেখতে পাওয়া যায়। যথা- কাওমী মাদ্রাসা ও আলিয়া মাদ্রাসা।

কাওমী মাদ্রাসা মূলত সমাজের মানুষের আর্থিক পৃষ্ঠপোষকতায় পরিচালিত শিক্ষা পদ্ধতি। এখানে বিনামূল্যে ছাত্র-ছাত্রীদের ইসলামী নানা বিষয়ে শিক্ষা দেয়া হয়। পবিত্র কুরআনের হিফয বা মুখস্থকরণ বিদ্যা এ শিক্ষা মাধ্যমের প্রধানতম আবদান। এছাড়া কুরআন, হাদীস, তাফসীর, ফিকহ, আরবী ভাষা ও সাহিত্য ইত্যাদির উপর এ মাধ্যমে বিশেষ দৃষ্টি দেয় হয়। বর্তমানে এগুলোর পাশাপাশি বাংলা, ইংরেজী, ইতিহাস, গণিত ইত্যাদিও এ মাধ্যমে শিক্ষা দেয়া হচ্ছে।

মাদ্রাসা পদ্ধতির অন্যতম একটি শিক্ষা মাধ্যম হলো আলিয়া মাদ্রাসা। এটি সরকার কর্তৃক অনুমোদিত এবং নির্ধারিত সিলেবাস ও বোর্ডের অধীনে পরিচালিত। এ শিক্ষা মাধ্যমে ইসলামী শিক্ষার পাশাপাশি পার্থিব নানা বিষয় যথা- অর্থনীতি, সমাজবিজ্ঞান, দর্শন, রাষ্ট্রবিজ্ঞান ইত্যাদি বিষয়েও জোর দেয়া হয়। মূলত এ শিক্ষা পদ্ধতিতে বর্তমান কালের জ্ঞান-বিজ্ঞান ও ইসলামী মৌলিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের সমন্বয় সাধন করা হয়। ফলে শিক্ষার্থীগণ সহজেই বর্তমানের নানা সমস্যা সম্পর্কে অবহিত হতে পারে এবং সাথে সাথে পূর্ণাঙ্গ দীন ইসলামে প্রদত্ত সমাধান সম্পর্কেও জ্ঞান লাভ করতে পারে। এতদ্ব্যতীত বর্তমানে বাংলাদেশে ক্যাডেট মাদ্রাসা, ইংরেজী মাধ্যমে মাদ্রাসা শিক্ষা ইত্যাদিও চালু রয়েছে। ফলশ্রুতিতে আধুনিক বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে ইসলামী জ্ঞানের অনুশীলনও এদেশে সম্ভবপর হচ্ছে।

বাংলাদেশে ইসলামের প্রচার ও প্রসার

বর্তমান বাংলাদেশের প্রায় ৯০ ভাগ জনগণই মুসলিম। তথাপিও নানা মাধ্যমে এদেশের ইসলামের দাওয়াত পরিচালিত হচ্ছে। ইসলামী আদর্শ ও শিক্ষা প্রচারের জন্যও বেশ কিছু প্রতিষ্ঠান কাজ করে যাচ্ছে। বর্তমান বাংলাদেশের ইসলাম প্রচারের ক্ষেত্রে নিয়োজিত ব্যক্তি বা সংস্থা সমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো-

১. বিভিন্ন ইসলামী প্রতিষ্ঠান

বাংলাদেশে বিদ্যমান বিভিন্ন ইসলামী প্রতিষ্ঠানসমূহ নানাভাবে এদেশে ইসলামী অনুশাসনের বাস্ড়বায়নে কাজ করে যাচ্ছে। পূর্ববর্তী পাঠে এদেশের কতিপয় ইসলামী প্রতিষ্ঠানের পরিচয় তুলে ধরা হয়েছে। এসব প্রতিষ্ঠান নিজ নিজ ক্ষেত্রে ইসলামের প্রসারকল্পে নিয়োজিত রয়েছে। এদের প্রতিষ্ঠায়- এদেশে উত্তরোত্তরভাবে ইসলামের প্রচার ও প্রসার ঘটে চলেছে।

২. সূফী সাধকগণ

সূফী-সাধকগণ প্রাচীনকাল হতেই বাংলাদেশে ইসলাম প্রচারে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে চলেছেন। বর্তমানকালেও এর ব্যতিক্রম খুব একটা দেখা যায় না। এদেশের পীর-শায়খ, আলিম, সূফী-সাধকগণ বর্তমানেও ইসলাম প্রচারে অতুলনীয়। তাঁরা জ্ঞান প্রাচার, আধ্যাত্মিক দীক্ষাদান, লিখনী, ওয়াজ-মাহফিল, সভা-সমিতি, সেমিনার ইত্যাদির মাধ্যমে ইসলামের বিকাশে অবদান রাখছেন।

৩. তাবলীগ জামাত

বাংলাদেশের মানুষের মধ্যে ইসলামের প্রাথমিক ধারণা ও আমল সংক্রান্ড় প্রচারের কাজে তাবলীগ জামাতের ভূমিকা অবিস্মরণীয়। সারা বিশ্বে প্রচলিত এ দাওয়াতী কার্যক্রম বাংলাদেশেও ধর্মপ্রচারে ব্যপৃত রয়েছে। বাস্তব জীবনে ইসলামী অনুশাসনের প্রয়োগ ও অনুশীলনের প্রশিক্ষণে এর ভূমিকা অসামান্য। বৎসরে একবার বিশ্ব ইজতেমার আয়োজনের মাধ্যমে তাবলীগ জামাত বাংলাদেশে ইসলামের প্রচারে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছে।

বাংলাদেশের মুসলিমগণ ধর্মপরায়ণ ও ধর্মপ্রাণ। তাঁদের ঐকান্তিক আগ্রহ ও প্রচেষ্টায় এদেশে ইসলামের প্রকৃত আদর্শ ও শিক্ষা নানাভাবে বাস্ড়বায়িত হয়ে চলেছে। কিন্তু এতদসত্ত্বেও এদেশে অনেক কুসংস্কার, ধর্মের অপব্যাখ্যা ও অপব্যবহার বিদ্যমান। ধর্মের নামে অধর্মের অনুশীলনও এদেশে বিরল নয়। পাশাপাশি পাশ্চাত্যের সংস্কৃতির প্রভাবে অশ-ীল ও অশালীন সংস্কৃতি এদেশের সমাজ জীবনেও ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে চলেছে। এসব অপসংস্কৃতি ও ধর্মের অপব্যবহার হতে মুক্ত থেকে প্রকৃত ইসলামী আদর্শ অনুশীলন প্রতিটি মুসলিমেরই দায়িত্ব, এ লক্ষ্যে ব্যক্তি জীবনে যেমন আমাদের সবাইকে ইসলামী বিধি-বিধান অনুসরণ করতে হবে, তেমনি সবার মধ্যে ইসলামের আদর্শ ও শিক্ষা প্রচার করতে হবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়নঃ ১৫.৯

সংক্ষিপ্ত-উত্তর-প্রশ্ন

১. অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বাংলাদেশে ইসলাম চর্চা সম্পর্কে ব্যাখ্যা করুন।

২. বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় ইসলামী শিক্ষা অর্জনের যেসব সুযোগ বিদ্যমান আলোচনা করুন।

রচনামূলক প্রশ্ন

১. বাংলাদেশের মুসলিমদের ইসলাম চর্চা সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করুন।